গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসি-বেশধারী।
অখিলভুবন-অধিকারী ॥—ঐ।
মোর বঁধুয়া।
গৌর গুণনিধিয়া ॥—ঐ।
নিধি গৌরাঙ্গ—
কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু পতিত জনের বন্ধু ॥—ঐ।
করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কান্দে সর্ব্বভক্তগণ ॥—ঐ।

প্রাচীন বাঙ্গলা বৈষ্ণব পদ-গানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহা আমি অন্যত্র ("গৌরাঙ্গসেবক", অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩) আলোচনা করিয়াছি। এখানে আমি শুধু এই বলিতে চাই যে, তিনি নিজে যে সব ধুয়া গান করিয়াছিলেন বা অন্যের মুখে শুনিয়াছিলেন, সেগুলি ঐ জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে খুব উচ্চ দরের, উহাদের মধ্যে ভাবাবেগ ও আত্মবিহ্বলতার ছাপ অতি গম্ভীরভাবেই পড়িয়াছে। মহাপ্রভুর নিজের সম্পর্কিত ও ঐতিহাসিক বলিয়া এগুলির মূল্য খুব বেশী।

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
শারঙ্গধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস।
কাঁহা কানু কাঁহা কানু কাঁহা তারে পাঙ।
বিচ্ছেদ অনলে পোড়া পরাণ জুড়াঙ ॥—অদ্বৈতপ্রকাশ, ঈশান নাগর।
বহুকালে তোরে কালা লাগ পাইলাঙ।
অন্তরে বান্ধিমু ভবি নাহি ছাড়িবাঙ ॥—ঐ।
সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু ॥—চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
কি কহব রে সখি (আজুক) আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥—ঐ।
হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জরে ॥—ঐ।

ভজন-সাধন ব্যাপারে গুরুর আশ্রয় লাভ দরকার। এই গুরুদেবের ভরসা ও সাহায্য না হইলে উদ্ধারের উপায় নাই। তাই কবিরা ভবপারের কর্ণধার গুরুদেবের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভাঙ্গা নৌকা ছেঁড়া কাছি কেমনে হব পার।
যদি আমার গুরু সহায় থাকে।

ধরম হাইল ধরে ভাঙ্গা নৌকা ছেঁড়া কাছি
গুরু লাগাইব কিনারে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
গুরু কও কও কও একবার শুনি।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
ত্মবে কল্পতরু গুরু ভজার
ভব সেতু মুক্তি হেতু পদাম্বু যাব ॥—হরিলীলা, লালা জয়নারায়ণ সেন।

ইষ্টদেবতা ও গুরুদেবের প্রতি ভক্তি রাখিলেও মানুষ নিজের চিত্তকে "চেতাইয়া" অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ না রাখিলে সাধন-পথের সুসার হয় না। তাই এ দিকেও কবি গায়কদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

চেত রে আপনারে মনাই চেত রে আপনারে
মনাই, কে তোর আপনা।—প্রাচীন গীতাবলী (পুথি)।

অসাধারণ পুরুষ বা নারীর জন্য তাঁহাদের মায়ের ভাবনা যেরূপ, আমাদের সাধারণ নরনারীর জন্য সাধারণ মা-বাপের চিন্তা তাহা অপেক্ষা কম কি? প্রাচীন কবিদের ধূয়ায় মাতৃহৃদয়ের বেদনা অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুণের ঝি গো, কেমন কইরা দিবাম তোমায় বনে।—মৈমনসিংহ-গীতিকা,
১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

ফিরোজ খাঁ রণে গেল।
বিনায়া কান্দে মায়, বুকে রইল শেল ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

মায়ের জন্য সন্তানের টান,—

দিশা। মা তুই কোথায় রইলে গো।
তোর বালক সায়রে ভাসাইয়া ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

প্রাচীন সাহিত্যে দেবদেবীর লীলাখেলার কথাই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। তার পরে অসাধারণ মহিমান্বিত পুরুষদের গুণ ও কার্য্যের বিবরণ করিবার আগ্রহ দেখা যায়। এ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দুই চার জায়গায় সাধারণ নর-নারী সম্বন্ধেও কিছু কিছু কথা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ব্যক্তির কীর্ত্তি লইয়া রচিত গাথাসমূহেও ধূয়া পাওয়া যায়।

রূপের মূরতি পাঠান রে।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
বাজে রে বাজে রে ডংকা ইশাখার নামে বাজে ॥—ঐ।

দুঃখের আশঙ্কা বা পূর্ব্বাভাস এবং দুঃখের করুণ সুর ধূয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

নয়ান কেন নাচে।
না জানি কপালে কিবা আছে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
বাও নহে বাতাস নহে,
তরু কেনে হেলে।

নবীন কদম্বের ডাল

বায়ে ভা'ঙ্গে পড়ে ॥—মনসামঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষাল।

দিশা। আমার না হৈল মরণ।

কান্দিতে কান্দিতে আমাব গো যাইল জীবন ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা,

১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

এমন কে বা জানে গো এমন কে বা জানে।—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

নাবী-জীবনেব সুখ-দুঃখ এবং মিলন বিচ্ছেদেব আকুলতা ধুয়ার হ্রস্ব আয়তনের মধ্যে করুণ ও কোমল সুব জোগাইয়া দিয়াছে।

স্বামী হারা হয়্যা রে।

আব কত দিন বব চায়্যা বে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বিধি আমার দুঃখেব কপাল।

যেমন বিন্দার গোপাল ॥—ঐ।

আমার পতি নাই ঘবে বে দীননাথ।

আমি কাব লক্ষে রব বে নবীন বসতে ॥—ঐ।

বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।

একি যন্ত্রণা পিরীতে দুই দিন আমার সুখ হৈল না ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা,

২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

পারলাম না পারলাম না বন্ধু, মইলাম মাথার বিষে,

রে বন্ধু পারলাম না।—ঐ।

পাষাণ হৈয়াছে সাধু বৈদেশে।—ঐ।

প্রেমের নদী উজান হইয়া যায়,

আবে যায় মন বে।—ঐ।

প্রাণি মোর দহে দহে।

বাজার নন্দিনী কেন রে ময়না, এত দুঃখ সহে ॥—লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না।

দেখা দিয়া জুড়াও পবাণ ॥—ফাতেমার ছুরত-নামা (পুথি)।

পরাণে সে জানে।

মরম দুঃখ পরাণে সে জানে ॥—মনসামঙ্গল, বিদ্যাভূষণ (পুথি)।

আনন্দ ভেল দুঃখ দূরে গেল।

দূরের মানস যদি ভবানী মিলাইল ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।

বিবিধ—

রুহিত মাছের মুড়া খা রে ভইন, রুহি মুড়া খা।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

অতিথ আইল রে।

আমার দরজার মাঝারে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বাপৈ বাপৈ কাঁদে বাঙ্গাল ভায়া রে।

আর কি লইয়া যাবা পাঠনে রে ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগবণ)।

নদী রে কোন্ দিকে যাও বইয়্যা

কোথেকে আইলে বে নদী কিসের লাগিয়া বে

কোন্ দিকে যাও বইয়্যা।—মৈমনসিংহ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

হায় বে গাঙ্গের কি বাহার।

হায় রে গাঙ্গেব কি বাহাব ॥—ঐ।

ধুয়ার দুটি চারটি কথার সাহায্যে রূপক ও বহস্য প্রকাশেব চেষ্টাও দেখা যায়,—

সময়ে কমলেব মধু আপনি উথলে রে,

তাবে কে শিথায়।—সংগৃহীত।

দিশা। ভ্রমব বে নিশা যায় বইয়া।—মৈমনসিংহ-গীতিকা. ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

শ্রীরমেশ বসু

কঙ্কেলি পুষ্প

এই কঙ্কেলি ফুলের পরিচয় লইয়া একটু গোল বাধিতেছে। অভিধানে বলিতেছে,—"অশোকো হেমপুষ্পশ্চ কঙ্কেলিঃ শিশু-পুষ্পকঃ।"—ইতি বত্নকোষঃ। হেমচন্দ্র এবং হলায়ুধেবও এই মত। বৈজয়ন্তী বলিতেছেন,—"স্ত্রীপ্রিয়ে বঞ্জুলোঽশোকঃ কঙ্কেলিঃ কর্ণপূবকঃ।" দেখা গেল, সকল অভিধানকারগণই ইহাকে অশোকপুষ্পের নামান্তব বলিতেছেন। অমরসিংহ ত ইহাব নামও করেন নাই। অভিধানকারগণেব মতেই সকলে কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়া নির্দ্দেশ কবে। এই মতই এত দিন চলিয়া আসিয়াছে। আমিও যখন ১৩২০ সালে মহাকবি কালিদাসেব "ঋতুসংহারে"ব পদ্যানুবাদ করি, তখন এবং তৎপূর্ব্বে যখন পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত এই পুস্তক লইয়া আলোচনা কবিয়াছিলাম, তখন কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়াই জানিয়াছিলাম। তদনুসারে পদ্যানুবাদেও কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়া লিখিয়াছিলাম। সেই শ্লোক ও তাহার অনুবাদ হইতেছে,—

> শ্যামালতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ
> স্ত্রীণাং হবন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
> দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং
> কঙ্কেলিপুষ্পরুচিবা নবমালতী চ॥—(৩য় সর্গ, ১৮ শ্লোক)।

> শ্যামালতা কিশলয়   ফুলভাবে নত হয়
>   ভূষিত-ললনাকব তার কান্তি হবে।
> বিশদ দশন ভাস   চন্দ্রকান্তি ধবে হাস
>   অশোক মালতী তাবে শোভাহীন কবে।

মহাকবি কালিদাস তাঁহাব যাবতীয় কাব্য ও নাটকেব মধ্যে কেবলমাত্র একবার এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে কঙ্কেলিপুষ্প উল্লেখ কবিযাছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, কঙ্কেলিকে অশোক বলা চলে না। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তাব শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি, আই, ই, মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে আমাব কঙ্কেলি ও অশোকের প্রভেদ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। তাঁহাকে আমাব ঋতুসংহাব উপহার দিবার কয়েক দিন পবে তিনি আমাকে বলেন যে, সকলে যে ভুল কবে, তুমিও তাহাই করিয়াছ। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তুমি কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়াছ। তাব পব তিনি বলিলেন যে, যোধপুরেব প্রাচীন রাজধানী মণ্ডপপুর বর্ত্তমান মণ্ডোর ভ্রমণকালে তিনি একটি গাছ দেখেন, গাছটি ছাঁটা; গাছের উপরেতে সাদা গোল গোল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাতে গাছের ভারি বাহার হয়েছে; গাছের পাতা কতকটা

* ১৩৩৫, ৭ই আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কদ্বেলের পাতার মত, আর ডালে ছোট ছোট কাঁটা আছে। গাছের এই ফুলের বাহার দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, এই গাছের নাম "কঙ্কেড়"। এই প্রথম তাঁহার কঙ্কেলি গাছ দেখা। সে সময় সেপ্টেম্বর, কি অক্টোবর মাস হইবে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, ইহাই কালিদাসের "কঙ্কেলি"। ব্যাকরণে ড়, র, ল, বিকল্পে ব্যবহার হয়। সুতরাং "ড়" ও "ল" একই। দেশভাষায় "ল"কে "ড" করিয়া ফেলিয়াছে। তার পর তিনি দেখেন, যোধপুরের রাস্তার দু'ধারেই কঙ্কেলি গাছ। তিনি শুনিয়াছেন যে, বুঁধিতে ও মৃজাপুরেও এ গাছ আছে। শাস্ত্রী মহাশয় যদি ঐ গাছ দেখিয়া না আসিতেন, তাহা হইলেও আমাদিগের ধরিতে পারা উচিত ছিল যে, কঙ্কেলি ও অশোক এক বৃক্ষ নয়। কালিদাস অশোক সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী" অর্থাৎ অশোক হইতেছে বসন্ত পুষ্প। আর তিনিই আবার কঙ্কেলির নাম শরৎকালে উল্লেখ করিয়াছেন। অশোক হইতেছে লাল ফুল। বহু স্থানেই কালিদাস রক্তাশোক শব্দ ব্যবহার করিয়া অশোক যে লালফুল, তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। আর ঋতুসংহারের শরৎবর্ণনায় তিনি কঙ্কেলি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ, দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং হরতি" অর্থাৎ কঙ্কেলি ফুলের সৌন্দর্য্য এবং নবমালতী দাঁতের প্রভায় নির্ম্মল মৃদু-হাসিরূপ চাঁদের শোভাকে চুরি করিতেছে। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, চাঁদের শোভা সাদা, দাঁতের প্রভাও সাদা, সুতরাং কঙ্কেলিও সাদা, আর মালতিও সাদা। অতএব কঙ্কেলি সাদাফুল। যখন অশোক লালফুল এবং কঙ্কেলি সাদা ফুল, তখন ইহা এক হইতে পারে না। তাহার পর আর একটি প্রধান ব্যাপার হইতেছে যে, অশোক বসন্তপুষ্প এবং কঙ্কেলি শরৎপুষ্প। কালিদাসের বর্ণনা ধীরভাবে দেখিলে এই অশোক ও কঙ্কেলি যে দুইটি বিভিন্ন ফুল, তাহা বুঝিবার কাহারও অসুবিধা হয় না। অতএব অভিধানকারগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় কঙ্কেলির যে গাছ দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তাহার যে বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত অশোক গাছের আদৌ মিল নাই। অশোক ও কঙ্কেলি যে দুইটি আলাহিদা বৃক্ষ, তাহা বুঝিতে আর বোধ হয়, কাহারও অসুবিধা হইবে না।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

St. Petersburg Dictionaryতে কঙ্কেলির সহিত কঙ্কোলি কথাটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবপুরের রাজকীয় বোট্যানিক গার্ডেনের কিউরেটর শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস মহাশয় কঙ্কেলিকে Elaegnus umbellata, Thunb বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহাই কঙ্কেলি হইবে।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

উড়িষ্যায় বাশুলী

বাঙ্গালার অমর সাধক কবি চণ্ডিদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বাশুলীদেবীর নাম ও পূজার কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চণ্ডিদাস দেবীর পূজারী ছিলেন; সুতরাং দেবীব স্বরূপেব বিষয় সম্যক্ অবগত হইলে চণ্ডিদাসেব সাধন-পদ্ধতি জানিবাব পক্ষে একটু সুবিধা হইতে পাবে। বিশেষতঃ আজকাল বহু চণ্ডিদাস আবিষ্কারের সম্ভাবনা হওয়ায় পূজারী কোন্ ঠাকুরাণীব আরাধনা করিতেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হইবাবই কথা। পুরীতে বাশুলীদেবীর যে মূর্ত্তি ও পূজা-পদ্ধতি দেখিয়া আসিয়াছি, কাহারও কাজে লাগিতে পাবে ভবসায় তাহাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিবাব চেষ্টা করিব।

পুরীতে বড়দাণ্ডের নিকটে গলিতে বৈশাখ মাসেব বাত্রে গায়কেব গীতধ্বনি কর্ণগোচর হইল; স্বামী ও স্ত্রী সাজিয়া দুই পুরুষ দেশীয় ভাষায় গীত গাহিতেছিল, গানেব সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর নাচও চলিতেছিল। তাহাদেব নিকটে এক দেবীমূর্ত্তি দেখিলাম, বংশখণ্ড-বিনির্ম্মিত এবং কাগজে আবৃত। দেবীমূর্ত্তি উদ্দেশ্যেই নৃত্য-গীত। দেবীব মুখ অশ্বেব মুখেব মত। সংবাদ নিয়া জানিলাম, ইঁহার নাম 'ঘোড়ামুহ বাশুলী'।

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, বাঙ্গালাব কৈবর্ত্তদেব অনুরূপ উড়িষ্যায় কেওট জাতি আছে, তাহাবা এই দেবীর পূজা কবিয়া থাকে। সুতবাং দেবীমাহাত্ম্য জানিতে গেলে 'কেওটসাহী' বা কেওটদেব পাড়ায় সন্ধান লইতে হইবে। তদনুযায়ী সেখানে এক পবিবাবে প্রশ্নাদিব ফলে জানা গেল :—

চৈত্র-পূর্ণিমা হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বৎসবে একবাব মাত্র দেবীকে নৃত্যগীত সহকাবে পথে পথে ঘুরাইয়া আনা হয়। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা যে কেহ কবিতে পাবে না, তাব পূর্ব্বে স্বপ্নে আদেশ হওয়া চাই, এবং সে স্বপ্নাদেশ পালন কবিবার সময় কিঞ্চিৎ বক্তও দিতে হয়। আইনের রাজ্যে বক্তপাত অর্থে অবশ্য নবহত্যা নয়; প্রচলিত বীতি অনুসারে আঙ্গুল হইতে কয়েক ফোঁটা রক্ত ফেলা, সে আবাব তিন জনেব রক্ত হইলেই ভাল। দেবীকে নগব প্রদক্ষিণ করাইবাব সময় মহীবাবণ, রুক্মিণী-পবিণয় ইত্যাদি পৌবাণিক পালা গাওয়া হয়, হয় ত এইরূপ কোনও পালাই সে বাত্রে শুনিয়াছিলাম। এই বাড়ীর পূজা-সামগ্রীর মধ্যে প্রধান সম্পত্তি দেখিলাম—চারিখানি তালপাতার পুথি। দেবীব ভোগে মাছ-মাংসের বাবণ নাই, তবে যাহার গৃহে বিগ্রহের অধিষ্ঠান, তাহার আয় অনুযায়ী ত ভোগ হইবে, দিনে তিনবার ভোগের ব্যবস্থা,—জগন্নাথদেবের মন্দিরের ব্যবস্থা এখানেও অনুসরণ কবিবার চেষ্টা হয়। এখানে শুনিতে পাইলাম, "ঘোড়ামুহ" বাশুলী দেবীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে "বাশুলীসাহী"তে খোঁজ করা দরকার, শুধু কেওট-সাহীতে সন্ধান করিলে চলিবে না।

---

* ১৩৩৫। ২১এ আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সুতরাং কেওটসাহী ছাড়িয়া বাশুলীসাহীতে খোঁজ আরম্ভ করিলাম, জগন্নাথদেবের মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে বাশুলীসাহী। সাহীতে বাশুলীদেবীর মন্দির আছে বটে, কিন্তু সেখানে জ্ঞাতব্য কিছু পাইলাম না। দেবী মনুষ্যাকার, 'ঘোড়ামুহ' নহেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের চারি কোণে চারিটি মন্দির আছে,—বাশুলী,বারাহী, ষোলপুঅ মা এবং অলেই, এই চারি দেবীর মন্দির। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, এই অলেই কথাটার অর্থ সখী, এবং ইহা দ্রাবিড়মূলসম্ভূত। সে যাহা হউক, বাশুলীদেবীর এই মন্দির হইতে কিছু দূরে বশুলীসাহীতেই যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা পাইলাম,—একটি কুটীরে "ঘোড়ামুহ বাশুলী ঠাকুরাণী আছেন এবং এই কুটীরেই পুরুষানুক্রমে কেওটবংশীয় গৃহপতির নিকট ঠাকুরাণী নিয়মিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাতা স্বয়ং পূজারিণী। আশে পাশে সকলেই এই ঘোড়ামুহ বাশুলী ঠাকুরাণীর যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। আইন আদালতের ব্যাপার থাকিলে অর্থাৎ মোকদ্দমায় ঠেকিলে স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণ ঠাকুরাণীর শরণাপন্ন হন মাসিক অল্প বিস্তর যৎকিঞ্চিৎ পূজার ব্যয়ের পক্ষে আনুকূল্যও করিয়া থাকেন। পুরীর রাজা নাকি প্রতি পূর্ণিমায় নগদ এক টাকা এবং একখানি শাড়ী দিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর ন্যায় এই বাশুলী ঠাকুরাণীর পূজার পক্ষেও শনি মঙ্গলবার অতি প্রশস্ত দিবস।

এই দেবীর পূজাপদ্ধতি এবং ইতিবৃত্ত কিছু জানিতে চাহিলাম, কিন্তু কুটীরে প্রচুর পুথি-সংগ্রহ থাকিলেও সে সব রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অথবা কৌতুক" (হাস্যরস) শাখান্তর্গত বলিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোনও সুযোগ পাইলাম না। তবে পূজার উৎপত্তি বিষয়ে যে উপাখ্যান শুনিলাম, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা এ স্থলে দেওয়া হইল।—

কেওটগণ দাশমহারাজের সন্তান, এই সূত্রে তাহারা ব্যাসের সহিত সম্বদ্ধ, ব্যাস, পরাশর ও যোজনগন্ধার পুত্র। যোজনগন্ধা আবার দাশমহারাজের কন্যা। শৈশবে ব্যাস খেলিবার জন্য একটা ঘোড়া চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে ঘোড়া ধরিয়া আনা হয়। অশ্বকুলে সেই প্রথম সৃষ্টি। এ কারণে কেওটদের কাছে অশ্ব পবিত্র। যাহারা মিঠাই প্রস্তুত করে, ওড়িয়ায় তাহাদিগকে গুড়িয়া বলে, গুড়িয়া ও কেওটদের মধ্যে শত্রুতা ছিল, তাই গুড়িয়ারা কেওটদের দেবী ঘোড়ামুহ বাশুলীকে বলপূর্ব্বক তাহাদের গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কেওটদের কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা যখন সরলমনে এবং সাগ্রহে পূজা দিতেছে, তখন দেবী তাহাদের প্রতি দয়া করিবেনই, যেমন করিয়াই হউক,সে পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তাহারা পূজার উপকরণ সব প্রস্তুত করিয়া রাখিল, যথাসময়ে দেওয়াল ভেদ করিয়া দেবী কেওটদের মধ্যে দেখা দিলেন। তবে দেবী ঘর ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় গুড়িয়ারা খড়্গ দিয়া কাটিতে গিয়াছিল, ঘাও দিয়াছিল, তাহাতে ধড়টা পড়িয়া গেল, কিন্তু মুণ্ডটা আর কিছুতেই রাখা গেল না—শুধু মুণ্ড নিয়াই ঠাকুরাণী ভক্ত কেওটদের পূজা নিতে ছুটিলেন, সুতরাং দেবী "ঘোড়ামুহ।"

এই পূজা লইয়া ব্রাহ্মণ ও কেওটদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। নিত্যপূজা কেওট গৃহস্বামী

নিজে সমাধা করেন, নৈমিত্তিক পূজার ভার ব্রাহ্মণদের হাতে, ব্রাহ্মণেরা আসিয়া মাঝে মাঝে পূজা করিয়া যান এই পর্য্যন্ত। আমরা যে বাড়ীতে সন্ধান নিলাম, সেখানে গৃহকর্ত্রী নিজেই পূজা করেন। কারণ, তাঁর একমাত্র পুত্র ইতিপূর্ব্বে পূজারী ছিল, দেবী সম্বন্ধে বহু স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে একেবারে পাগল হইয়া যায়, চারিদিকে ঘোড়ার মুখই শুধু তাহার চোখে পড়িত। যাহা হোক, দেখা গেল, পূজারীর জাতি লিঙ্গ ভেদ নাই, স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্মণ কেওট সকলেই পূজা করিতে পারে।

কথাচ্ছলে ইহাও শুনিতে পাইলাম যে, বৈতরণী নদীর কাছে ও কটক জিলার স্থানে স্থানে কেওটরা এই ঘোড়ামুহ বাশুলী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। তবে তাহারা শুধু চৈত্র-পূর্ণিমা হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা—এই একমাস কাল পূজা করে। তাহা ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠানাদির বালাই নাই, এবং একখণ্ড বস্ত্র মাত্র তাহাদের দেবীর প্রতীক। সেই বস্ত্রখণ্ড সাধারণতঃ চালে গুঁজিয়া রাখা হয়, যথাকালে তাহা লইয়া রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বাহির করা হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনায়ক মিশ্র মহাশয়ের নিকটে জানিতে পারিলাম, বালেশ্বর হইতে ১৭ মাইল দূরে নীলগিরি ষ্টেটের সজিনগড় গ্রামে বাঢ়জাতি এই ঘোড়ামুহ বাশুলী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

উড়িষ্যার স্থানে স্থানে অনুসন্ধানের ফলে বাশুলী দেবীর সম্বন্ধে সম্ভবতঃ বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যাইতে পারে। এই ঘোড়ামুহ বাশুলী ঠাকুরাণীর কথা উড়িষ্যা ছাড়া অন্যত্র কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হয় ত ইনি প্রথমে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন, পরে হিন্দু দেবদেবীর পঙ্ক্তিতে স্থান পাইয়াছেন, হয় ত বা ইনি দ্রাবিড়দেশাগতা। আমরা ইঁহার বিষয়ে এতই কম জানি যে, এ বিষয়ে বর্ত্তমানে আলোচনা করা সম্ভব বা নিরাপদ্ নয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

গীতগ্রামের আবিষ্কার

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি-এ ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষানুরাগী অনুসন্ধিৎসুর জন্য নিজ পল্লী-অঞ্চলে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের একটী সুন্দর সংগ্রহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মারফৎ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার এই শব্দসংগ্রহ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, এবং স্বদেশের ভাষা ও ইতিহাসের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগপ্রসূত তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, উৎসাহ ও পরিশ্রম ছাত্রগণের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। সম্প্রতি তিনি তাঁহার দেশের মাটির ভিতর হইতে কতকগুলি অমূল্য প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। মুরশিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমার সাল ডাকঘরের অন্তর্গত গীতগ্রামে তাঁহার বাড়ী। এই স্থান মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও নদীয়া—এই আধুনিক চারিটি জেলার সংযোগস্থলে, একেবারে উত্তর-রাঢের হৃদয়দেশে। প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চল বাঙ্গালাদেশে হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতার একটী কেন্দ্র। সভ্যতায় এই অঞ্চল বাঙ্গালাদেশে অগ্রণী। এখানকার প্রতিষ্ঠার নিদর্শন পাই চীন পরিব্রাজকদের গ্রন্থে, সংস্কৃত-সাহিত্যে এবং জয়নাগদেবের সময় (Epigraphia Indica, XVIII, পৃঃ ৬০) হইতে আরম্ভ করিয়া নানা তাম্রশাসনে। বহু প্রাচীন দীঘী, এবং প্রাচীন মন্দির বিহারাদির ধ্বংসাবশেষ ঢিবি ও ডাঙ্গা দ্বারা এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি সূচিত হয়। কর্ণসুবর্ণ এই দেশের বিখ্যাত নগরী ছিল।

এ অঞ্চলে এখনও প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে কোনও খনন-কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু খননের উপযুক্ত ঢিবি ও ডাঙ্গা যথেষ্ট আছে। খুঁড়িতে আরম্ভ করিলে বড়গাঁও, নালন্দা বা পাহাড়পুরের মতন প্রাচীনের অমূল্য রত্নাবলী যে আবিষ্কৃত হইবে না, এ কথা বলা যায় না। শুনা যাইতেছে, প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এই অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং শীঘ্রই না কি রাঙ্গামাটি অঞ্চলে খনন-কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীমান্ রবীউদ্দীনের গ্রামের বাহিরে "সৈদগুর ডাঙ্গা" নামে একটী ঢিবির অস্তিত্বের কথা তাঁহার মুখে বহুদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। এই ঢিবির উপরে বিস্তর কবর আছে, আর নিকটে একটী পীরের আস্তানা বা দরগা আছে। জোর বৃষ্টি হইলে ধোয়াট জলে অনেক সময়ে এই ঢিবি হইতে নানা প্রকারের প্রাচীন যুগের জিনিস বাহির হইয়া থাকে—আবার গ্রামের ছেলেরাও খুঁড়িয়া কিছু কিছু জিনিস মাঝে মাঝে বাহির করিত। গ্রামের লোকে এই সব জিনিস কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখে। শ্রীমান্ রবীউদ্দীন আমাকে কয়েক মাস পূর্ব্বে এইরূপে প্রাপ্ত কতকগুলি কাচের মুসলমানী তসবীর মালার দানা দেখান—নীল মীনার কাজের মত কাচের বড়ো বড়ো দানা, ছোটো দানা, কালো রঙের, আবার কাচের গায়ে সোজা বাঁকা হলদিয়া

* ১৩৩৫।২১এ আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আর অন্ত রঙ্গের রেখাটানা। এ ছাড়া দুই একখণ্ড নীল গ্লেজ-করা পাত্রের টুকরা। বহু পূর্ব্বে একজন কৃষক না কি একটী ধাতুমূর্ত্তি—কোনও দেবমূর্ত্তি পাইয়াছিল, সেটী তাহার সন্তানদের খেলার জন্ত দেয়। পরে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই সব জিনিস ঢিবি জমীর উপর উপরই পাওয়া গিয়াছিল। এগুলির গুরুত্ব তাদৃশ বেশী নহে। কারণ, এগুলি হালের জিনিস। তথাপি আমি শ্রীমান্‌কে উৎসাহ দিই, যাহাতে তিনি অবহিত থাকেন, কখন কি বাহিরায়, এবং সম্ভব হইলে ঢিবিতে গিয়া নিজে যাহাতে একটু অনুসন্ধান করেন।

এই বর্ষায় ওই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তাহার ফলে জল পড়িয়া ঢিবির কতক অংশ ধ্বসিয়া যায়। ধসা অংশের মাটির মধ্য হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ বস্তু বাহির হইয়াছে। শ্রীমান্ বসীউদ্দীন সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কাশীনাথনারায়ণ দীক্ষিত মহাশয়দ্বয়কে দেখান হয়। জিনিসগুলি এই :—

১। সাতটী তাম্রমুদ্রা, চৌকা আকারের। সব কয়টীতেই একপ্রকারের চিহ্ন মুদ্রিত আছে। একটী মুদ্রা—যেটা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অবস্থায়, তাহা হইতে এই চিহ্নগুলির অবস্থান জানা যাইতেছে,—(১) হস্তী, সুন্দরভাবে অঙ্কিত, (২) বৃষমুণ্ড-চিহ্ন Taurine Symbol; (৩) Crux Ansata, (৪) চৈত্য, (৫) পুষ্করিণী, (৬) বেষ্টনী-মধ্যস্থিত দ্রুম। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু ও শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয়দ্বয়ের মতে এই প্রকার মুদ্রা ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন Cast Coins বা পুরাণ মুদ্রার পরের যুগে প্রচলিত ছিল, খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক (আনুমানিক) প্রাপ্ত তাম্র-মুদ্রা কয়টীর কাল। এই প্রকারের মুদ্রা ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশেও পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ মুদ্রা কোনও রাজা বা রাজশক্তির নামে প্রচারিত হইত না, বণিক্‌সঙ্ঘদ্বারা এই প্রকারের মুদ্রা নিজ নিজ টাঁকশালে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। ধাতুর বিশুদ্ধি প্রদর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গল্যসূচক চিহ্ন দ্বারা "লাভ" ও "শুভ" বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া এই সব চিহ্ন দ্বারা মুদ্রাগুলি লাঞ্ছিত হইত।

২। একটী পোড়া-মাটির ভগ্ন খর্পরখণ্ডের উপরে গোল মুদ্রার আকারে একটী মোহরের ছাপ, তাহাতে এক ছত্র কি লেখা যেন মুদ্রিত আছে। লেখাটী পড়া যাইতেছে না, কিন্তু অনুমান হয়, ইহা কোনও নামমুদ্রার ছাপ, মাটিতে তুলিয়া পোড়াইয়া শক্ত করা হইয়াছে। এই-রূপ মুদ্রার মৃন্ময় ছাপ এলাহাবাদের দক্ষিণে ভীটার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গিয়াছে, ইহা শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয়ের মত।

৩। একটী মৃৎপাত্রের খণ্ড, ইহাতে একটী অস্পষ্ট নক্সাকাটা আছে। এইরূপ জিনিসও ভীটা অঞ্চলে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

৪। কতকগুলি মালার দানা—লাল কাচের, কাল-মাটির। Cornelian, Agate প্রভৃতির দানাগুলি খুবই প্রাচীন।

এই সকল জিনিস হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গীতগ্রামের ঢিবি—যাহা 'সৈদগুর ঢিবি' বলিয়া

পরিচিত, একটী প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ। মাটি খুঁড়িয়া দেখিলে ঢিবির ভিতর হইতে বিস্তর প্রাচীন বস্তু বাহির হইবে আশা করা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগে গিয়া এই স্থানের প্রাচীনতা পঁহুছানো অসম্ভব নয়। বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের পক্ষে এইরূপ স্থানের খননের বিশেষ সার্থকতা আছে। পাহাড়পুরে প্রাচীন বাঙ্গালার যে অবিনশ্বর কীর্ত্তির নিদর্শন—তাহার ধর্ম্মকথা, তাহার শিল্প, ভাস্কর্য্য ও বাস্তুশিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে নূতন তথ্য পাওয়া গেল, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর কাছে গৌরবের জিনিস, এবং ভারতবর্ষের পক্ষেও গৌরবের জিনিস। গীত-গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী বাঙ্গামাটিতে খনন আরম্ভ হইলে এইরূপ গৌরবের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে আশা করি। শ্রীমান্ রবীউদ্দীন আধুনিক শিক্ষিত জনের উপযুক্ত মানসিক জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল লইয়া স্বগ্রামের এই মৃৎস্তূপকে প্রথম প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের সমবেত চেষ্টার ফলে এই স্তূপের সমস্ত গোপন রহস্য বাহির হইয়া আমাদের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য ও বস্তু প্রদান করিয়া, সেই অতীতকে আরও গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলুক, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণের সম্মুখে শ্রীমান্ রবীউদ্দীনের অনুরোধে তাঁহার প্রাপ্ত জিনিসের এই যৎসামান্য পরিচয় প্রদানকালে আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনাই করিতেছি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গীতগ্রাম

মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ও গঙ্গার তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত কান্দী মহকুমার মধ্যে, কান্দী শহরের ৮ মাইল দক্ষিণে ভরতপুর থানার এলাকাধীন গীতগ্রাম একটি ছোট পল্লী। মুরশিদাবাদ জেলার মানচিত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। মুরশিদাবাদের সাবেক কালেক্টারীর নথিতে এবং আমাদের বাটীতে রক্ষিত ১৫০ বৎসরের এক পুরাণো দলিলে মৌজার নাম 'গাঁধ গা' লিখিত আছে। তখনকার দিনে লোকের অশুদ্ধ উচ্চারণের দরুণ গীতগ্রাম যে 'গাঁধগা' বা 'গাঁদগা' বা 'গীতগা' আকার পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও সাধারণে 'গাদ্ গা'ই বলিয়া থাকে। উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে স্থানীয় লোকে প্রায় প্রত্যেক কথার মধ্যে বা অন্তে একটা অকারণ 'হ' যোগ করিয়া থাকে। এই হেতু 'গাদ্'কে গীদ্হ্ বলে। এই 'হ' যোগ করার দুই একটি উদাহরণ দিতে চাই। যেমন 'ভাত বেঁধেছেন'কে 'ভাত বেঁধ্হেছেন', ইত্যাদি, কাজেই 'গীত গা'কে গীদ্হ্ বা গাঁধ গা বলিত। পূর্ব্বে এখানে গান বাজনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এ স্থানটি শিল্প-বাণিজ্যের স্থান ছিল বলিয়া বেশ আমোদ প্রমোদেরও স্থান ছিল। সকল ব্যবসা বাণিজ্যের স্থানেই পূর্ব্বে গান বাজনার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে এ গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় গানের দল ছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির সহিত গানের প্রতিযোগিতা (পাল্লা) চলিত। ৫০।৬০ বৎসর আগেও এখানে বিভিন্ন প্রকারের গানের দল ছিল। হইতে পারে, এখানে 'গীতা'র আলোচনাও পূর্ব্বে হইত। এই সকল কারণে গ্রামের নাম 'গীতগ্রাম' হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

গ্রামের অবস্থানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার পিতৃদেব (মোল্লা আব্দুল বারী সাহেব, বয়স ৬৫) বলেন যে, তিনি বাল্যকালে ৮০।৯০ বৎসর বয়সের প্রাচীনদের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, গ্রামটি বর্ত্তমানে যেখানে রহিয়াছে, পূর্ব্বে তাহার পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত প্রকাণ্ড বিলের ধারে ঢিবির পার্শ্বেই ছিল। সেখানে প্রচুর ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুক্রা (খোলাংকুচি) এখনও রহিয়াছে। গীতগ্রাম এককালে বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র স্থল ছিল। গ্রামের উত্তরে ঘাট পুকুর' নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। এই ঘাটে নানা দেশ হইতে আগত নানারূপ বাণিজ্য দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ বড় বড় নৌকা লাগিত। গ্রামের উত্তরে অবস্থিত ভেড়া ডাঙ্গা হইতে উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া কোণাকুণিভাবে প্রায় ১২ মাইল ব্যাপিয়া এক বৃহৎ জলভাগ ছিল—কান্দীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত নবদুর্গা গোলাহাট (ঘাট) পর্য্যন্ত এই জলভাগ বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বদিকে গঙ্গার সহিত ইহার যোগ আছে। এই জন্য নানাদিক্ হইতে বণিক্গণ আসিবার সুবিধা পাইতেন। পাটনা, মুঙ্গের, গৌড়, মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ৭০০।৮০০ মণ বোঝাই নৌকা সহজে আসিতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এই

১৩৩৫। ২১এ আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বৃহৎ জলপূর্ণ ভূভাগের উপর দিয়া তামাক প্রভৃতি বোঝাই করিয়া বড় বড় নৌকা আসিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে ঢিবি বা ডাঙ্গার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যে কত পুরাণো, তাহা বলা যায় না। লোকে বলে যে, বহুপূর্ব্বে ঐ ঢিবির উপর গওহে আজম্ হজরৎ সুফি সাহ্ সৈয়দ গওহর আলী সাহেবের আস্তানা ছিল এবং ঐ স্থানেই তিনি সমাহিত রহিয়াছেন। এই জন্য ঐ ঢিবিকে লোকে সৈয়দ্ গওহর বা সৈদ্ গহুর বা সৈদ্গোর বা সেদ্গুর-ডাঙ্গা বলে। তৎপূর্ব্বে ঐ স্থানে হিন্দু বা বৌদ্ধদিগের কোন কীর্ত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রাধান্তের অবসান হইলে এবং মুসলমান সভ্যতার অভ্যুদয় হইলে ঐ স্থানটিও মুসলমানগণের আয়ত্তাধীন হয় এবং তথায় উক্ত মহাত্মার আস্তানা ও পরে সমাধি হয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত মস্জিদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে উহার চিহ্নমাত্রও নাই। সম্প্রতি এই ঢিবির কিছু পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড দালানের ভিত্তি বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি এখান হইতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে প্রতি বৎসরই উক্ত সৈদ্গুর-ডাঙ্গায় সৈয়দ্ গওহর সাহেবের স্মরণে গ্রামবাসিগণের উৎসব হইত এবং এখনও হয়। ঢিবির সীমানার মধ্যে কেহ পাদুকা ব্যবহার করিতে পারেন না। এই ডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী পাড়াকে ডাঙ্গাপাড়া বলে—ইহারই দক্ষিণে ইন্তালার ডাঙ্গা, এ স্থানে মুসলমানযুগের চরম উন্নতির সময়ে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মুসলমান সাধু, সুফী, ফকির, দরবেশগণের বাস ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রামের সকল অধিবাসীই মসলমান। কিন্তু পূর্ব্বে যে এখানে হিন্দুদিগের বাস ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, এখানকার বড় বড় দীঘির নাম শিল্পীদিগের নামানুসারে রহিয়াছে, যথা—তাঁতিপুকুর, বেণেপুকুর, কামারপুকুর, মাঝিপুকুর ইত্যাদি। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে যে পুকুরটি রহিয়াছে, তাহার নাম ঘোষকাচাল (কাজোল> কজ্জল)। এতদ্ব্যতীত মুসলমানী নামযুক্ত মিঞাপুকুরও একটী গ্রামের মধ্যে আছে। গ্রামে যে শিল্পী ও বণিক্-সম্প্রদায়ের বেশ প্রাচুর্য্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কেন না, গ্রামের মধ্যে একটি 'সরস্বতী ঘর' ছিল। বালক পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহাকে ঐ ঘরে লইয়া গিয়া তাহার হাতে খড়ি দেওয়া হইত। ঐ দিন ছেলের বাড়ীতে বেশ খাওয়া-দাওয়ার ধুমধাম ও অন্যান্য উৎসব হইত। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর হইল, এ প্রথাটি উঠিয়া গিয়াছে।

গ্রাম সম্বন্ধে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিয়া এক্ষণে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। কলিকাতায় আমার বি এ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভাষাতত্ত্ব পাঠকালে আমার অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের গ্রামের ভাষা ও গ্রামের প্রাচীনতার বিষয়ে আলোচনা করিলে, তিনি আমায় উপদেশ দেন যে, যদি আমি আমাদের দেশের প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা ও শব্দ সংগ্রহ-কার্য্যে ও গ্রামের প্রাচীন

নিদর্শন সংগ্রহ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারি, তবে ভাষাতত্ত্বের ও দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার অনেক উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারিবে। এই সময় আমি তাঁহারই উপদেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যপদ গ্রহণ করি। পরিষদের কার্য্য-প্রণালী ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আমার দেশের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ করি। ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সে শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঢিবির নিকট হইতে যে সমস্ত প্রাচীন জপমালা, মৃৎপাত্র প্রভৃতি পাইয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের গ্রামটির বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমার ছোট ভাই শ্রীমান্ মোল্লা আব্দুল বাকী ঐ ঢিবির নিকট খেলা করিতে করিতে একটি ধাতব দ্রব্য পায়। তাহা অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকায় সেটিকে আমরা মুদ্রা বলিয়া অনুমানই করিতে পারি নাই। বিগত গ্রীষ্মকালে বাড়ী গিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর উপদেশে ঐ ঢিবিটি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি। এবারকার অতিরিক্ত বর্ষণে ঢিবির খানিকটা স্থান ধ্বসিয়া যাওয়ায় সেই স্থান হইতে কতকগুলি মুদ্রা, জপমালার দানা, ভগ্ন মৃৎপাত্র, শীল মোহর প্রভৃতি পাইয়াছি। পরে এগুলি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে দেখাই। তিনি সেগুলি মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের নিকট এবং আর্কিওলজিকাল সার্ভের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথনারায়ণ দীক্ষিত এম এ মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা মুদ্রাগুলি দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ইহারা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর। এই মুদ্রাগুলি ব্যতীত সম্প্রতি প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে আরও কয়েকটি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সংক্ষেপে যে মত দিয়াছেন, তাহা আমার বক্তব্যের শেষে লিপিবদ্ধ করা হইল।

কালবশে এবং অতিবর্ষণের ফলে ঢিবির চতুষ্পার্শ্ব সম্প্রতি উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন কবর খুঁড়িবার সময় অনেক পুরাতন কবর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন কবরে মৃত ব্যক্তিকে পশ্চিম শিয়রে, কোনটিকে দক্ষিণ শিয়রে, আবার কোনটিকে পশ্চিম শিয়রে শায়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লামী শাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তিকে উত্তর শিয়রে শায়িত করাই বিধেয়। এ বিষয়ে প্রাচীনেরা বলেন যে, এস্থানে পূর্ব্বে একবার বড় লড়াই হইয়াছিল—যে যেখানে পড়িয়া মরিয়াছিল, তাহাকে সেইভাবে সেইখানেই কবর দেওয়া হইয়াছিল, শাস্ত্রীয় বিধান মানিয়া চলিবার তখন অবসর ছিল না। দুই বৎসর পূর্ব্বে এক কবর হইতে একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার চুং (গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত স্থানের অস্থি) পৌনে দুই হাতের কিছু বেশী লম্বা।

ইহা ছাড়া পূর্ব্বে কোন কোন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় মাটির নীচে প্রচুর কড়ি, কোন পুষ্করিণীর মাটির নীচে প্রচুর কয়লা পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একটি পুষ্করিণী হইতে একটি প্রস্তর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিটি এক্ষণে এক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ধারে রহিয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে, আমাদের গ্রামটি অতি প্রাচীন এবং

ইহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা দরকার। অনুসন্ধানে এই শ্রেণীর আরও অনেক দ্রব্য মিলিতে পারে। মিলিলে বহির্জগতের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র অপরিজ্ঞাত ও সভ্য-সমাজে অপরিচিত পল্লীর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারিবে। আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্য-রূপে পরিষদের কর্তৃপক্ষ ও চিত্রশালা-সমিতির নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পূজার ছুটীর সময় কতিপয় অভিজ্ঞ সদস্যকে গীতগ্রাম পাঠাইয়া ঐ ঢিবিটির ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহের অনুসন্ধান করিবেন। এ স্থানে মৌর্য্যযুগের (বৌদ্ধ) নিদর্শন, হিন্দু-রাজত্বের নিদর্শন (গুপ্তরাজবংশের) এবং পদ্মশোভিত ইষ্টক, জপমালা প্রভৃতি দ্বারা সূচিত প্রাচীন মুসলমান সভ্যতার নিদর্শনও পাওয়া যাইতেছে। এই জন্য অনুমান হয় যে, এই স্থানটিতে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার যুগের ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ মিলিতে পারে।

এই সকল দ্রব্য আবিষ্কার ও সংগ্রহ ব্যাপারে আমার ছোট দুইটি ভাই, শ্রীমান্ মোল্লা আব্দুল বাকী এবং মোহাম্মদ সালেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এবং আমার পিতৃদেব জোনাব মোল্লা আব্দুল বারী সাহেব পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি যোগাড় করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। অশ্বারোহী মূর্ত্তি, পোড়ামাটি—১

২। স্ত্রী-মূর্ত্তির খণ্ড, পোড়ামাটি—১

৩। কাল পোড়া মাটির টুক্‌রার উপর পদ্মের ছাপ—১

৪। লিপিযুক্ত গোলাকার মাটির মোহর—১

৫। মোহরের ছাঁচ—১

৬। লিপিযুক্ত মাটির ছাঁচের ভগ্নাংশ—১

৭। মুদ্রা—১৩

৮। বর্ত্তুলাকার ধাতব পদার্থ—৪

৯। ধাতব দ্রব্যের টুক্‌রা—১

১০। নানা রংএর পাথরের মালার দানা—শতাধিক

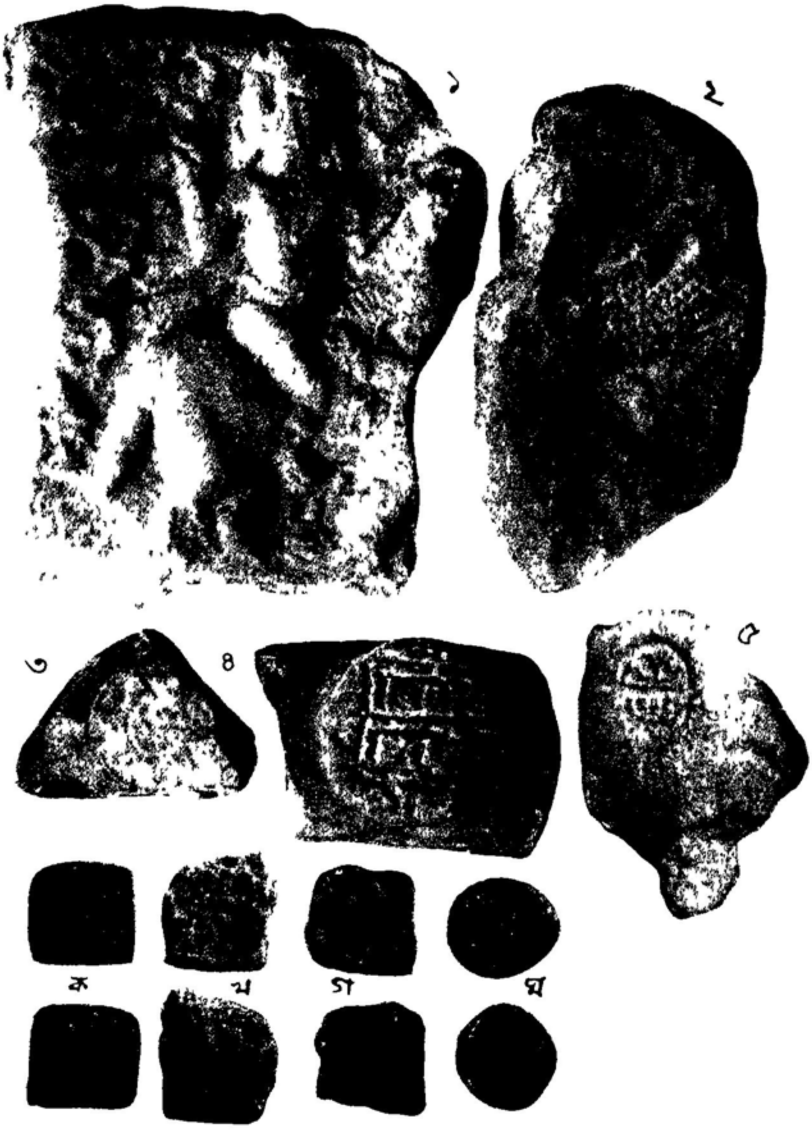
১১। পদ্মযুক্ত ইষ্টক খণ্ড—.

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে ১ম দফার অশ্বারোহিবিশিষ্ট ইষ্টকখণ্ড (চিত্র ১) এবং দ্বিতীয় দফার স্ত্রী-মূর্ত্তিবিশিষ্ট মৃন্ময় খণ্ড (চিত্র ২) মৌর্য্যযুগের এবং এগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর। ৪র্থ দফার লিপিযুক্ত মোহরটির লিপি অস্পষ্ট (চিত্র ৪)। ৫ম দফার মোহরের ছাপটিতে "মাতৃচন্দ্রস্য" লিখিত আছে এবং লিপির উপরের অংশে একটি ক্রুস ও তাহার উভয় পার্শ্বে সমৃণাল পদ্ম রহিয়াছে। ইহা খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর। মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলি (চিত্র ক, খ, গ) প্রাচীন ভারতীয় ছাঁচে ঢালা। এই শ্রেণীর মুদ্রা পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় বেড়াচাঁপায় (চন্দ্রকেতুর গড়ে) পাওয়া গিয়া-

ছিল। এগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় ও ১ম শতাব্দীর। উহাদের এক পৃষ্ঠে—(১) চৈত্য,(২) বেষ্টনী-মধ্যস্থ দ্রুম, (৩) পুষ্করিণী এবং (৪) বৃষমুণ্ড চিহ্ন (Taurine Symbol) রহিয়াছে ও অপর পৃষ্ঠে—(১) বৃষমুণ্ড চিহ্ন, (২) হস্তী, (৩) Crux Ansata এবং (৪) স্বস্তিক চিহ্ন রহিয়াছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে যে একটি গোলাকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক পৃষ্ঠে হস্তী ও অপর পৃষ্ঠে চৈত্য। ইহা অন্ধ্র গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী মালব মুদ্রা, এবং ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর (চিত্র ঘ)।

এই সকল সংবাদ দানের জন্য আমি বিনীতভাবে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই সকল দ্রব্য দেখিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর অনুপ্রেরণা ব্যতীত আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্য সম্ভব হইত কি না সন্দেহ, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় এই বিবরণ প্রকাশে এবং দ্রব্যাদির চিত্র প্রস্তুতের জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকটও আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ



গীতগ্রামে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি

রামগিরি

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥"

"তীব্র কান্তা-বিরহ-বেদনা! দীর্ঘ বরষ প্রভুর শাপ,
ভ্রষ্ট-মহিমা—হবে যে ভুগিতে স্বকর্ম্মে অবহেলার পাপ;
ছায়া-তরু-ঘন, পুণ্যসলিল—সেবিত-জনক-তনয়া-স্নান,
সেই রামগিরি আশ্রমে এক যক্ষ করিলা অধিষ্ঠান।"

মেঘদূতে বর্ণিত কালিদাসের মানস পুত্র এই যে স্বকর্ম্মে অনবহিত অভিশপ্ত যক্ষটি দুর্ব্বিষহ কান্তাবিরহ-শোক হৃদয়ে ধরিয়া, সুদীর্ঘ একটী বৎসর জনক-তনয়া-স্নাত পুণ্যোদকে সিক্ত স্নিগ্ধ-চ্ছায়াতরুসমন্বিত রামগিরিতে বাস করিয়াছিল, সে রামগিরি কোথায়? কোথায় সে রামগিরি—যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থানের জন্য কালিদাস তাহার রামগিরি নাম প্রদান করিয়াছেন? আর কোন্ গিরির সলিল জনক-তনয়ার স্নানে পুণ্যোদকে পরিণত হইয়াছিল? আর কোথায় বা স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুতলে রামসীতা আপনাদের আশ্রম পাতিয়াছিলেন? কেবল তাহাই নহে, এ কথাটিও মনে রাখিতে হইবে যে, যে তুঙ্গ শৈলটি আলিঙ্গন করিয়া যক্ষের দূত মেঘ বিরাজ করিতেছিল, সেই রামগিরির মেখলা দেববন্দ্য রঘুপতি-পদে অঙ্কিত।

"আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।"

আরও একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, সেখানে সিদ্ধাঙ্গনারাও অবস্থিতি করিয়া থাকে।

"অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ॥"

"অদ্রিশৃঙ্গ উড়ালো নাকি গো পবনে?—হেরিবে সে উদ্যোগে
ঊর্দ্ধমুখী যে সিদ্ধাঙ্গনা মুগ্ধা তাহারা চকিতচোখে।"

আর সেখানকার মেঘের খেলাটিও মনে রাখিতে হইবে। অভিশপ্ত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে রামগিরির সানুদেশ আলিঙ্গন করিয়া বপ্রক্রীড়ায় † তির্য্যগদন্তপ্রহারে অভ্যস্ত গজের ন্যায় মেঘ দেখিয়াই ব্যাকুল হইয়া উঠে।

---

* ১৩২৫।১২ই অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† বপ্রক্রীড়া—উৎখাত-কেলি, মাটি খুঁড়িয়া খেলা।

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুম
বপ্রক্রীড়াপরিণত* গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥"

তাহার পর তাহাকে গিবিমল্লিকার অর্ঘ্য দিয়া, অলকায় কান্তার নিকট যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। সুতবাং বামগিরিব মেঘ লইয়াই কালিদাসের মেঘদূতের সৃষ্টি। প্রধানতঃ রামগিরি সম্বন্ধে এই কথা কয়টি মনে বাখিয়া, ইহার অবস্থানের কথাটিও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

এই অবস্থান লইয়াই যত গোলযোগ। কালিদাস মেঘকে যদি সোজা পথে লইয়া যাইতেন ও সেই সোজা পথের পরিচয় দিয়া দিতেন, তাহা হইলে এত গোলযোগ ঘটিত না। আর তাঁহার রামগিরি নামও গোলযোগ বাধাইয়াছে। যক্ষ প্রথমে মেঘকে তাহার পথের কথা বলিয়া দিয়া, পবে প্রিয়তমাব নিকট সংবাদ দিবাব কথা বলিয়াছিল। পথের কথা প্রথমে সে বলিল,—

"স্থানাদস্মাৎ সবসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পবিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥"
"বেতসস্নিগ্ধ এই স্থান হ'তে উত্তর-নভে উঠো তখন,
দিঙ্নাগেদেব পরিহবি পথে স্থূল শুণ্ডেব আস্ফালন।"

যক্ষ মেঘকে উত্তর মুখে আকাশে উঠিতে বলিতেছে। তাহার পর বলিতেছে,—

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুবভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎপশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥"
" 'তব আয়ত্ত কৃষিফল' ভাবি প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনে তারা
দেখিবে তোমারে জনপদবধূ—ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ যারা।
হলকর্ষণে সদ্য সুবভি মালভূমি পরে আরোহি', আর
পশ্চাতে কিছু আসি, লঘুগতি উত্তরে তুমি যেয়ো আবার ॥"

পূর্ব্বে যক্ষ মেঘকে উত্তরমুখে আকাশে উঠিতে বলিয়াছে। তাহার পর বলিতেছে, মালক্ষেত্রে আরোহণ করিয়া কিছু পশ্চাতে যাইয়া, আবার উত্তর মুখে যাইও। পশ্চাতে কোথায় যাইতে হইবে, যক্ষ তাহাও বলিয়া দিতেছে,—

"ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।"

তোমার ধারাসম্পাতে যাহার দাবাগ্নি প্রশমিত হয়, সেই আম্রকূট পর্ব্বত তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। পরে বলিতেছে,—

* পরিণতঃ তির্য্যগ্‌দন্তপ্রহারঃ, তির্য্যগ্‌দন্তপ্রহারস্ত গজঃ পরিণতো মত ইতি হলায়ুধঃ।

"স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিঃ তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য॥"
"বিহরে কুঞ্জে বনচরবধূ, সেথা মুহূর্ত্ত রহিয়া গিয়া,
বর্ষণলঘু দ্রুততরগতি পরের পথটি উত্তরিয়া,
উপলবিষম বিন্ধ্যের মূলে পাবে বিশীর্ণা রেবার দেখা,
গজের অঙ্গে রচনাভঙ্গী বিরচিত যেন বিভূতি-রেখা।"

আম্রকূটের বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া, বারিবর্ষণে লঘুগতি হইয়া কতক পথ গেলে, বিন্ধ্যের পাদদেশে বিশীর্ণা রেবা বা নর্ম্মদাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা উভয়েরই দর্শন মিলিবে। সেখান হইতে যক্ষ মেঘকে একেবারে দশার্ণ বা পূর্ব্বমালব প্রদেশে যাইতে বলিতেছে। তাহার সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী বিদিশায় (বর্ত্তমান ভিল্‌সায়) কিছুকাল থাকিয়া, বেত্রবতী নদীর সহিত প্রেমলীলা করিয়া, বক্রপথে উজ্জয়িনীতে যাইতে উপদেশ দিতেছে। উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া, তাহার পশ্চিমে গম্ভীরা নদী পার হইয়া, উত্তর-পশ্চিম দিকে দেবগিরি গিয়া, চর্ম্মণ্বতী বা চম্বল নদী পার হইতে হইবে। তাহার পর দশপুর বা মান্দাশোর। দশপুর হইতে সোজা উত্তরমুখে ব্রহ্মাবর্ত্ত, পরে কনখল গিয়া হিমালয় পার হইয়া মানস-সরোবর। সেখান হইতে কৈলাসে পঁহুছিয়া অলকায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই অলকা কুবেরের রাজধানী, এইখান হইতেই কুবেরের শাপে যক্ষ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তাহার প্রিয়তমা এই অলকাতেই রহিয়াছে। তাই মেঘকে অলকায় পঁহুছিয়া তাহার নিকট যাইতে হইবে।

আমরা রামগিরি হইতে মেঘ কোন্ পথে অলকায় যাইবে, তাহার উল্লেখ করিলাম। ইহাতে রামগিরির অবস্থান কোথায় হইতে পারে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। কালিদাসের যক্ষ প্রথমে মেঘকে উত্তরমুখে আকাশে উঠিতে বলিল, তাহার পর তাহাকে কিছু পশ্চাতে যাইয়া আবার উত্তরমুখে যাইতে বলিতেছে।

"কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ।"

এই 'পশ্চাৎ' কথা লইয়াই গোলযোগ বাধিয়াছে। পশ্চাৎ অর্থে পিছন দিক্ ও পশ্চিম দিক, দুইই হইতে পারে। মল্লিনাথ এখানে 'পশ্চাৎ' অর্থে পিছন দিক্‌ই ধরিয়া লইয়াছেন। কালিদাস যে পিছন দিকের অর্থে পশ্চাৎ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা দুই এক স্থল হইতে তাহাও দেখাইয়া দিতেছি।

"কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি দৃষ্টিপাতম্"।—রঘু, ১৩।১৮।
"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্তুতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"—শকু, ১ম অঙ্ক।

সুতবাং এখানে 'পশ্চাৎ' অর্থে পিছন দিক্ হইতে পাবে। যক্ষ মেঘকে রামগিবি হইতে পশ্চাতে আম্রকূট পর্ব্বতে যাইতে বলিতেছে। এই আম্রকূট পর্ব্বত বর্ত্তমান অমবকণ্টক।* সেথান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি। যক্ষ আম্রকূটেব পরই বিন্ধ্য ও নর্ম্মদার দেখা পাইবে বলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে 'পশ্চাৎ'এব পিছন দিক্ অর্থ করিলে, রামগিবিব অবস্থান কোথায় হয় এবং পশ্চিমদিক্ অর্থ ধরিলেই বা তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, আমবা তাহাই বলিতেছি। আমবা বলিয়াছি, মল্লিনাথ 'পশ্চাৎ'এব পিছন দিক্ অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। মেঘদূতের ইংবাজী অনুবাদক উইলসন্ সাহেব ইহাব পশ্চিম দিক্ অর্থই ধবিয়াছেন,—

"Thence sailing north and veering to the west,
On Amracuta's lofty ridges rest ;"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও পশ্চিম দিকই ধবিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি পিছন দিকের কথাও বলিয়াছেন। যদি পিছন দিক্ অর্থ ধবা যায়, তাহা হইলে আম্রকূট বা অমরকণ্টক হইতে বামগিবিব অবস্থান উত্তব দিকেই হয। কাবণ বামগিবিতে মেঘ উত্তর মুখে উঠিয়া পিছন দিকে আসিলে, দক্ষিণ দিকে আসিবে ও অমবকণ্টকে আসিয়া লাগিবে। তাহা হইলে অমবকণ্টক হইতে বামগিবি উত্তব দিকেই হইবে। আব যদি পশ্চাতেব পশ্চিম দিক্ অর্থ ধবিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অমবকণ্টক হইতে বামগিবি পূর্ব্বদিকে হইবে। এক্ষণে অমরকণ্টকেব উত্তব দিকেই বা কোন্ পর্ব্বত আব পূর্ব্বদিকেই বা কোন্ পর্ব্বতকে বামগিবি বলা যাইতে পারে, আমরা এখন তাহাই দেখিব। তবে এ কথাটি মনে বাখিতে হইবে যে, যে পর্ব্বতের সহিত শ্রীবামচন্দ্রেব বিশেষরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাকেই রামগিরি বলিতে হইবে।

অমবকণ্টক হইতে উত্তব দিকে যে পর্ব্বতেব সহিত বামচন্দ্রেব বিশেষরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা চিত্রকূট। মল্লিনাথ বামগিবি অর্থে চিত্রকূটই বলিয়াছেন। "রামগিবেঃ চিত্রকূটস্যাশ্রমেষু।" উইলসন সাহেব চিত্রকূটেব কথা বলিয়া প্রবাদানুসাবে আবও কোন কোন পর্ব্বতের উল্লেখ কবিয়াছেন।† শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'পশ্চাৎ'এব পশ্চিম দিক্ অর্থ ধবিয়া অমর-

---

* 'The course pointed out to the cloud, and an allusion which follows to the vicinity of the Narmada river, furnish us with reasons for supposing, that the mountain here mentioned is that more commonly designated by the name of Omercuntuc. The change of sound is not more violent than it is in a number of evident corruptions from the Sanskrit language, now current in the dialects of India'—Wilson.

† 'Ramgiri is a compound term signifying the mountain of Rama, and may be applied to any of those hills in which the hero resided during his exile, or peregrinations. His first and most celebrated residence was the mountain Chitracuta in Bundelcund, now known by the name of Comptah, and still a place of sanctity and pilgrimage. We find that tradition has assigned to another mountain, a part of the

কণ্টকের পূর্ব্বে রামগিরি বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে সরগুজা রাজ্যের রামগড় পর্ব্বতই রামগিরি। আরও কেহ কেহ সে কথা বলিয়াছেন।* শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মেঘদূতে বলিতেছেন,—"সকলেই জানে, বৃষ্টি না হইলে চাষ হয় না। বৃষ্টি তোমার আয়ত্ত, তাই তুমি উঠিলে যত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সে দৃষ্টিতে হাব নাই, ভাব নাই, চাতুর্য্য নাই, বিলাস নাই, বিভ্রম নাই, আছে কেবল প্রাণ কেড়ে-নেওয়া প্রীতি আর চোখ-জুড়ান মধুরিমা। তাহাদের এতই আগ্রহ, এমনি সরলতা, আর হৃদয়ের এতই আবেগ যে, বোধ হয়, যেন তাহারা তোমাকে পানই করিয়া ফেলিবে। এই ভাবে তুমি উঁচু রসা ভুঁয়ের উপর উঠিবে। নীচু জমির উপর হইতে পাহাড় উঠে। খানিক পাহাড় উঠিলে তাহার উপর সময়ে সময়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমি হয়। উহার নাম মালভূমি।† অনেক মালভূমি আছে বলিয়া ভারতের অনেক প্রদেশের নাম মালব। মালভূমি সূর্য্যের আতপে বড়ই তাপিত হয়, তাই চাষ করিবার পর এক আছড়া জল হইলে একটা খুব সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। তুমি সেই গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে সেই মালভূমির উপর দিয়া খানিক পশ্চিম দিকে যাও, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইও।

এইখানে কালিদাস একটু চাতুরী খেলিলেন। মেঘকে খানিকটা পশ্চিম মুখে পাঠাইলেন। কারণ, *মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে আবার সেই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দিয়া* অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশের ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পক রথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কবির প্রিয়ভূমি সকল দেখান হইবে না। তাই কবি কৌশল করিয়া উঁচু জমির উপর দিয়া মেঘকে খানিকটা পশ্চিম দিকে সরাইয়া দিলেন। পথটা একটু তেরছা

Kimoor range, the honor of affording him, and his companions, Sita and Lacshmana, a temporary asylum upon his progress to the south, and it is consequently held in veneration by the neighbouring villagers'—Capt Blunt's Journey from Chunarghur to Yertnagoondum, Asiatic Researchers, 7. 60.

"An account of a journey from Mirzapore, to Nagpore, however, in the Asiatic Annual Register for 1806, has determined the situation of the scene of the present poem, to be in the vicinity of the latter city · the modern name of the mountain is there stated to be Ramtec; it is marked in the maps Ramtege, but I understand the proper word is Ramtinc, which in the Mahratta language has probably the same import as *Ramagiri* the hill of *Rama*. It is situated but a short distance to the north of Nagpore, and is covered with buildings consecrated to Rama and his associates, which receive the periodical visits of numerous and devout pilgrims."—Wilson's Megha Duta.

* S. C. De—Kalidas and Bikramaditya.

† পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমতল ভূমির নাম অধিত্যকা। ইংরাজী Tableland. মল্লিনাথ মাল অর্থে উচ্চভূমি বলিয়াছেন,—"মালং মালাখ্যং ক্ষেত্রং শৈলপ্রায়ম্ উন্নতস্থলম্ (মালমুন্নতভূতলমিত্যুৎপলঃ) 'মাল' শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—"মালং দেশে বনেঽপ্যুগং মালঃ গ্রামান্তরাটবী। মালং মালোর্দ্ধ্বপ্রদেশে চ", ইত্যাদি।

হইল, কিন্তু কবির নূতন জগৎ দেখাইবার বড় সুবিধা হইল। কবি ইহার পর উজ্জয়িনী দেখাইবার জন্য পথটা আরও তেরছা করিয়াছেন।

অথবা রামগিরিব আকার ও অবস্থান দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা একটী ক্ষুদ্র সমতল হইতে উঠিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র সমতলেব উত্তব পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ধনুরাকারে অভ্রভেদিনী পর্ব্বতমালা। রামগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তরমুখে উঠিতে গেলেই মেঘ মহাশয় এই ধনুরাকার পর্ব্বতে বাধিয়া যাইবেন। তাই কালিদাস বলিয়াছেন, উত্তরমুখ উঠিয়াই একটু পিছু হটিয়া যাইবে, তাহাব পর আবার উত্তরমুখে যাইবে। কিন্তু এবাবও অভ্রভেদী পর্ব্বত। দক্ষিণ হইতে বাতাস মেঘকে উত্তর দিকে ঠেলিলে পাহাড়ে বাধা পাইয়া মেঘ পশ্চিমে যাইবে। এইরূপভাবে উত্তরমুখে যাইতে গেলেই, এই মালভূমি উঠিতে গেলেই—মালবদেশে প্রবেশ করিতে গেলেই প্রথমেই আম্রকূট পর্ব্বত—এখনকাব অমবকণ্টক। এই বিস্তৃত পর্ব্বতেব একটীমাত্র উচ্চ শিখব। পর্ব্বতটী অনেক দূর লইয়া মোচাগ্র আকারে উঠিয়াছে, ইহাব এক দিক্ দিয়া নর্ম্মদা, আব এক দিক্ দিয়া মহানদী ও আব এক দিক্ দিয়া শোণনদ প্রবাহিত হইতেছে। অনেক দূর লইয়া থব করিয়া মোচাগ্র আকারে আম্রকূটের উচ্চ শৃঙ্গ উঠিয়াছে।'

শাস্ত্রী মহাশয় প্রধানতঃ পশ্চাতেব পশ্চিম দিক্ অর্থ ধরিয়া পিছন দিক্‌ও হইতে পাবে বলিতেছেন। কিন্তু তিনি বামগড হইতেই মেঘকে পিছনে হটাইতেছেন। এক্ষণে বামগড়ের সহিত বামচন্দ্রেব কিরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাই বিবেচনা কবিয়া দেখিতে হইবে। একমাত্র প্রবাদ ভিন্ন ইহাব সহিত বামচন্দ্রেব সম্বন্ধেব কোন কথাই জানা যায় না। এখানে বামসীতা স্নান কবিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, একটী নির্ঝবও বহিযাছে। দুইটী পদচিহ্ন শ্রীবামচন্দ্রেব বলিয়া লোকে দেখাইয়া থাকে। একখানি প্রস্তরখণ্ডে রামসীতা ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তিও আছে।* কেবল ইহারই উপর নির্ভব কবিয়া বামগড়কে বামগিরি বলা যাইতে পারে কি না, ইহা বিবেচনা কবিয়া দেখিতে হইবে। প্রবাদানুসারে আবও দুই এক স্থান রামগিবি হইতে পারে, তাহা আমবা উইলসন সাহেবের উক্তি হইতে দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহাদের অবস্থানেব সহিত মেঘদূতেব বর্ণনার ঐক্য হয় না। 'পশ্চাৎ' শব্দেব পশ্চিম অর্থ ধবিলে, রামগড়কে অবশ্য রামগিবি বলা যাইতে পারে। তবে রামগড় হইতে অমবকণ্টক সোজা পশ্চিমে নহে, কিছু দক্ষিণও বটে! প্রবাদে অনেক স্থানেব সহিত রামচন্দ্রেব সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে। সুতবাং বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত একমাত্র প্রবাদেব উপব নির্ভব কবিয়া বামগড় রামগিরি হইতে পারে কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আব যথন 'পশ্চাৎ'এব পিছন দিক্ অর্থ হইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন, তথন অমরকণ্টক হইতে রামগিরিকে উত্তর দিকে লইয়া গেলে, যদি রামচন্দ্রের সহিত বিশেষ ভাবে সম্বদ্ধ কোন পর্ব্বত পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই রামগিরি বলিতে হয়।

* শ্রীযুক্ত অসিত হালদার মহাশয় ১৯১৫ অব্দের Modern Review পত্রে রামগড় সম্বন্ধে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যে যে স্থানের সহিত রামসীতার সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, আমরা অবশ্য তাহার জন্য প্রধানতঃ রামায়ণের প্রমাণই গ্রহণ করিব। বিশেষতঃ কালিদাস রামচরিত বর্ণনা করিতে রামায়ণের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার রামগিরির অবস্থান স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে রামায়ণের নিকটই যাইতে হইবে। এক্ষণে কোন্ কোন্ পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা রামায়ণ হইতে দেখাইতেছি। রামায়ণে প্রথমতঃ তিনটি পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের বিশেষভাবে সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রথমে চিত্রকূট, তাহার পর গোদাবরীর নিকটস্থ প্রস্রবণাকুল পর্ব্বত, অবশেষে মাল্যবান্। গোদাবরীর নিকটস্থ প্রস্রবণাকুল পর্ব্বতকে ভবভূতি প্রস্রবণগিরি বলিয়াছেন। "জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।" রামায়ণে কিন্তু "গিরিং প্রস্রবণাকুলম্" কথাটি আছে। রামায়ণের বর্ণনানুসারে মাল্যবান্‌কেই প্রস্রবণগিরি বলিয়াই জানা যায়।* কালিদাস মাল্যবান্ ও চিত্রকূটের কথা বলিয়াছেন। জনস্থানমধ্যগ প্রস্রবণাকুল বা প্রস্রবণগিরির কথা বলেন নাই। ভবভূতি তিনটি পর্ব্বতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই তিনটির মধ্যে মাল্যবানের সহিত সীতার সম্বন্ধ ঘটে নাই। চিত্রকূট ও জনস্থানের প্রস্রবণাকুল বা প্রস্রবণ গিরির সহিতই রামসীতা উভয়েরই সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। জনস্থান অমরকণ্টক, বিন্ধ্য ও নর্ম্মদার দক্ষিণ, সুতরাং সেখানে অবশ্য রামগিরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই চিত্রকূটকে ধরিয়া বসিতে হইতেছে। এক্ষণে চিত্রকূট রামগিরি হইতে পারে কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। রামায়ণে যে যে পথ দিয়া রামচন্দ্র গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রামগড়ের পড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই। চিত্রকূট হইতে বক্রভাবে যে রামচন্দ্র গিয়াছিলেন, রামায়ণ হইতে তাহা জানা যায় না। চিত্রকূট হইতে অত্রি মুনির আশ্রম হইয়া রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরাধ রাক্ষসের সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ভবভূতি

---

* "অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।
আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্॥—কিষ্কি, ২৭-১।

ইহার পরের সর্গে দেখা যাইতেছে,—

"স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥"—কিষ্কি, ২৮-১।

হনুমান্ লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া আসিয়া, বানরগণ সহ প্রস্রবণ পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে সমস্ত কথা বলিয়াছিল,—

"ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্।
প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্॥
যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ।
প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমুঃ॥—সুন্দরা, ৬৫-১।২

এই প্রস্রবণ গিরি হইতে রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রকৃতিবাদ অভিধানে প্রস্রবণ গিরিকে মাল্যবান্‌ই বলা হইয়াছে।

—

এই স্থানকে বিন্ধ্যাটবীমুখ বলিয়াছেন। "এবং বিন্ধ্যাটবীমুখে বিরাধসংবাদঃ।" সুতরাং রামায়ণানুসারে রামচন্দ্রের রামগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার সহিত যে রামচন্দ্রের কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, রামায়ণে তাহারও উল্লেখ নাই। কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে যে যে স্থান দিয়া পুষ্পক রথকে লইয়া গিয়াছেন, রামায়ণে তাহাদের সকলেরই বর্ণনা আছে। রামগড়ের কথা রামায়ণেও নাই, রঘুবংশেও নাই। যদি রামগড়ই কালিদাসের রামগিরি হইত, তাহা হইলে তিনি রঘুবংশে কি তাহার উল্লেখ করিতেন না? তাঁহার সেই স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু-সমন্বিত, জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকে সিক্ত রামগিরি রামগড় হইলে, তিনি তাহার উল্লেখে বিরত হইতেন বলিয়া মনে হয় না। ভবভূতির আলেখ্যেও রামগড়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজেই একমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া, রামগড়কে রামগিরি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে রামায়ণে চিত্রকূটের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত মেঘদূতের রামগিরির ঐক্য হয় কি না, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। কালিদাস রামগিরিকে স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুসমন্বিত জনকতনয়াস্নাত পুণ্যোদকে সিক্ত বলিয়াছেন। তাহা একটি তুঙ্গ শৈল বটে, তাহার মেখলা দেববন্দ্য রঘুপতি-পদে অঙ্কিত। সেখানে সিদ্ধাঙ্গনারা থাকে, ইহারা দেবযোনিবিশেষ, আর সেখানকার মেঘের খেলার কথাও বলিয়াছেন। আমরা চিত্রকূটে এ সকল দেখিতে পাই কি না, তাহাই বলিতেছি। রামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে নিষাদপতি গুহের শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগ তীর্থে আসিলেন। সেখানে ভরদ্বাজ মুনির নিকট তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশের কথা বলিলে, মুনি তাঁহাকে চিত্রকূটের কথাই বলেন। ভরদ্বাজ বলিতেছেন,—

"দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ সর্ব্বতঃ শুভদর্শনঃ॥
গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥
যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমাধত্তে ন মোহে কুরুতে মনঃ॥
ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্।
তপসা দিবমারূঢ়াঃ কপালশিরসা সহ॥"

—রামায়ণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, অযো—৫৪।২৮-৩১।

"বৎস! এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মহর্ষিগণে অধ্যুষিত এবং বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুল-সেবিত চিত্রকূট নামে বিখ্যাত গন্ধমাদনতুল্য এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে, তুমি সেইখানে বাস করিবে। মনুষ্য যত দিন পর্য্যন্ত সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল অবলোকন করে, ততদিন পর্য্যন্ত কল্যাণ সমাধানেই ব্রতী থাকে, বিমুগ্ধচিত্ত হয় না। তথায় কপালতুল্য শুষ্ক মস্তকশালী অনেক ঋষি শত বৎসর বিহার করিয়া তপঃপ্রভাবে দেবলোকে গিয়াছেন।" রামচন্দ্রের বিদায়-কালে আবার ঋষি বলিতেছেন,—

"মধুমূলফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ ॥
বাসমৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল ।
নানানগগণোপেতঃ কিন্নরীগণসেবিতঃ ॥
ময়ূরনাদাভিরুতো গজরাজনিষেবিতঃ ।
গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ ॥
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলাযুতঃ ।
তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি ॥
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব ।
সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্ ॥'—(অযো, ৫৪—৩৮-৪২ ।)

"তুমি মধু, মূল ও ফলসমন্বিত চিত্রকূট পর্ব্বতে যাও। সেই লোকবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ গজ-সমন্বিত, ময়ূরশব্দে প্রতিধ্বনিত, বিবিধ বৃক্ষ-বিরাজিত, কিন্নরীসমূহে সেবিত, নানাবিধ ফলমূলবিশিষ্ট, পুণ্যপ্রদ ও অতি রমণীয়, অতএব আমি বোধ করি যে, তোমার সেইখানেই বাস করা উচিত, অতএব তুমি তথায় যাও। রঘুনন্দন। সেই পার্ব্বতীয় বনমধ্যে হস্তী ও মৃগসমূহ বিচরণ করিয়া থাকে তুমি তাহাদিগকে এবং সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরী, কন্দর ও নির্ঝর সকল দেখিবে।"

তাহার পর চিত্রকূটের নিকট উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—

"মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসঙ্ঘানুনাদিতম্ ।
চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্ ॥
সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে ।
পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে ॥"—(অযো, ৫৬—১০, ১১ ।)

"ঐ উচ্চ শিখরসমন্বিত ও পক্ষিসমূহের কূজনে মুখরিত চিত্রকূট পর্ব্বতে হস্তিগণ বিচরণ করিতেছে। দেখ ভ্রাতঃ! আমরা ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের সমভূভাগবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষ সমাকীর্ণ রমণীয় অথচ পুণ্যপ্রদ কাননে আনন্দ অনুভব করিব।" ভরত রামচন্দ্রের দর্শনে চিত্রকূটে যাইতে উদ্যত হইলে, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকেও চিত্রকূটের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্ঝরকাননঃ ॥
উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী ।
পুষ্পিতদ্রুমসঞ্ছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা ॥—(অযো, ৯২—১০, ১১

"সেখানে রমণীয় নির্ঝর ও কানন-সমাকীর্ণ চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে। পুষ্পিত তরুগণ-সমাবৃতা রমণীয় কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে।"

চিত্রকূটে অবস্থানকালে রামচন্দ্র সীতাকে চিত্রকূট দেখাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে চিত্রকূটের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ ।
ভার্য্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ ॥

ন রাজ্যাদ্ভ্রংশনং ভদ্রে ! ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্॥
পশ্যেমমচলং ভদ্রে ! নানাদ্বিজগণায়ুতম্।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্॥
কেচিদ্রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ।
পীতমাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ॥
পুষ্পার্ককেতকাভাশ্চ কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভাঃ।
বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ॥
নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষ্বৃক্ষগণৈর্বৃতঃ।
অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ॥
আম্রজম্বসনৈর্লোধ্রৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরপি।
অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ॥
কাশ্মর্যারিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি।
বদর্য্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রধন্বনবীজকৈঃ॥
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ॥
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান্।
কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে ! রমমাণান্ মনস্বিনঃ॥
শাখাবসক্তান্ খড্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীডোদ্দেশান্ মনোরমান্॥
জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্যন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবদ্ভির্ভাত্যযং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ॥
গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহূন্।
ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ॥

* * *

ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্বতঃ শুভঃ।
কুষ্ঠস্থগরপুন্নাগভূর্জ্জপত্রোত্তরচ্ছদান্।
কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলায়ুতান্॥
মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ।
কামিভির্বনিতে ! পশ্য ফলানি বিবিধানি চ॥"—(অযো, ৯৪)

পরে ইন্দ্র শচীকে যেমন রমণীয় বস্তু দর্শন করান, সেইরূপ অমরসদৃশ দাশরথি রাম, ভার্য্যাকে

চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় শোভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! এই পরমরমণীয় শৈল সন্দর্শন করিয়া আমার মনে রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃজ্জনবিয়োগজন্য দুঃখ হইতেছে না। কল্যাণি! দেখ, এই পর্ব্বত নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকুল, ইহার ধাতুমান্ শিখর-সকল যেন গগনতলের উপরিভাগ স্পর্শ করতঃ ইহাকে বিভূষিত করিতেছে; কোন শিখর রজতসদৃশ, কোন শিখর শোণিততুল্য, কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় রক্তবর্ণ, কোন কোন শিখর সুশোভন মণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। এই শৈলরাজের বিবিধধাতুবিভূষিত প্রদেশসমূহের কোন স্থান পুষ্পরাগ তুল্য, কোন স্থান স্ফটিকমণিসম, কোন স্থান কেতক পুষ্প সমান, কোন প্রদেশ নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃ-প্রভঃ, কোন কোন স্থল বা পারদতুল্য প্রভাময়রূপে শোভা পাইতেছে। এই ভূধর বহুবিধ মৃগগণ দ্বারা সমাবৃত, বিবিধ বিহঙ্গকুলসমাকুল এবং হিংসাদি দোষ-রহিত, ব্যাঘ্র, তরক্ষু ও ভল্লূকসমূহ দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া শোভান্বিত হইতেছে। এই শৈলশ্রেষ্ঠ আম্র, জম্বু, লোধ্র, পীতশাল, পিয়াল, পনস, ধব, কর্ম্মরঙ্গ, তিনিশ, তিন্দুক, বিল্ব, বেণু, গাম্ভারী, নিম্ব, শাল, মধুক, তিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রযব ও দাড়িম্ব প্রভৃতি পুষ্পফলশোভিত ছায়াসমন্বিত মনোরম বৃক্ষরাজিদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া ইহার মনোহর শোভা সম্যক্ বৃদ্ধি করিতেছে। প্রিয়ে! দেখ, পর্ব্বতের রমণীয় সানুদেশে এই সকল কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া কামবশত হৃষ্টচিত্তে কেমন ক্রীড়া করিতেছে! বিদ্যাধরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধরী-দিগের বসনসকল রমণীয় ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষসকলের শাখায় সংযুক্ত রহিয়াছে, দেখ। কোন কোন স্থানে পৃথিবী ভেদ করিয়া উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত জলপ্রপাত এবং কোন কোন স্থানে নির্ঝর দ্বারা এই শৈল মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহাদ্বাবস্থিত সমীরণ, নানা কুসুমের সৌরভ বহন করতঃ সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন না করিতেছে? * * * এই চিত্রকূটশিখর যেন বসুধাতল ভেদ করতঃ সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহার শিখর-সকল সকল দিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কামীদিগের শতদল-দলযুক্ত,—উৎপল, পুত্রজীবক, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্রনির্ম্মিত উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট শয্যাসকল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। প্রিয়ে! দেখ, কামিগণের পরিভোগে মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমলমালাসকল এবং ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে।"

চিত্রকূটের এইরূপ বর্ণনা হইতে, বিশেষতঃ 'গন্ধমাদনসন্নিভঃ,' 'প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিং', 'শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈঃ' ইত্যাদি কথায় কালিদাসের 'তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলম্,' রামায়ণের 'সমভূমিতলে রম্যে ক্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে,' 'ছায়াবদ্ভিঃ মনোরমৈঃ' কথায় মেঘদূতের "স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু,' রামায়ণের 'কিন্নরী-গণসেবিতঃ,' 'পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্' কথায় 'মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ' কথার ঐক্য আছে কি না, সকলকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। সিদ্ধ কিন্নর, বিদ্যাধর সকলেই দেবযোনি, যক্ষও তাহাই। যেখানে এইরূপ কিন্নর কিন্নরী—বিদ্যাধর বিদ্যাধরীর ক্রীড়াস্থল, যক্ষের কি সেইখানে অবস্থান করা সম্ভব নহে? কালিদাস কি তাহাকে সেইখানে লইয়া যান নাই? তাহাকে অলকা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, একেবারে বনবাস দেওয়া

হয় নাই। আর যক্ষের ন্যায় কুবের সিদ্ধ, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতিরও রাজা। কাজেই তাহারা যেখানে যুগলভাবে থাকে, যক্ষকে দণ্ডস্বরূপ একাকী সেইখানেই নির্বাসিত করাই সম্ভব।

এক্ষণে জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকের কথা বলা যাইতেছে। চিত্রকূটের পার্শ্বেই মন্দাকিনী নদী, এ কথা বলা হইয়াছে। রাম সীতাকে সেই মন্দাকিনী নদী দেখাইয়া বলিতেছেন,—

"বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংসসারসসেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥
নানাবিধৈস্তীররুহৈর্বৃতাং পুষ্পফলদ্রুমৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্বতঃ॥

* * *

ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্।
ক্বচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥

* * * *

বিধূতকল্মষৈঃ সিদ্ধৈস্তপোদমশমান্বিতৈঃ।
নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ॥
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি॥"

* * * *

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েঽদ্য ত্বয়া সহ॥" —(অযো, ৯৫)

"প্রিয়ে! হংসসারস-সেবিতা, কুসুমিততরুগণোপশোভিতা, বিচিত্র পুলিনশালিনী মন্দাকিনী নদী দেখ। ইতস্ততঃ ফলপুষ্পসমন্বিত বহুবিধ তীরতরু দ্বারা কুবেরের অলকাস্থ মন্দাকিনীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছে। * * * দেখ, এই মন্দাকিনী নদীর কোন স্থান বিপুল তটশালী, কোন স্থান সিদ্ধজনগণ সমাকুল এবং কোন স্থানে মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল জল দেখা যাইতেছে। * * * তপস্যা ও শমদমসমন্বিত পুণ্যাত্মা সিদ্ধগণ নিত্য যাহার জলে স্নান করেন, তুমি আমার সহিত তাহাতে স্নান কর। প্রেয়সি! তুমি মন্দাকিনীর সখীর ন্যায় শুভ্র ও রক্তবর্ণ কমল-সকল নিক্ষেপ করতঃ নদীতে অবগাহন কর। * * * আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ও ফলমূল আহার করতঃ অযোধ্যা ও রাজ্যের কামনা করি না।" ইহার সহিত কি 'জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' কথার ঐক্য হয় না?

রামায়ণে চিত্রকূটের মেঘের খেলার কথা নাই। কারণ, রামচন্দ্র বসন্তকালে চিত্রকূটে গিয়াছিলেন। সীতাকে দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন,—

"স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে॥"—(অযো, ৫৬-৬।)

"দেখ, এই বসন্তকালে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষসকল স্ব স্ব পুষ্পে মালাধারী হইয়াছে।" কিন্তু কালিদাস নিজ রঘুবংশে চিত্রকূটে মেঘের খেলার কথা বলিয়াছেন।

"ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ * শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ।
বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ॥—(রঘু, ১৩-৪৭)।

নির্ঝরধারার শব্দোদ্গারী গুহামুখে হে বন্ধুরগাত্রি, ঐ দেখ, শৃঙ্গে মেঘরূপ বপ্রপঙ্কলগ্ন চিত্রকূট দৃপ্ত বৃষভের ন্যায় আমার চক্ষু বদ্ধ করিতেছে। মেঘদূতে আমরা 'আশ্লিষ্টসানুং, বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং মেঘম্' দেখিয়াছি আর রঘুবংশে 'শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কো দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূট' দেখিতেছি। সেখানে মেঘ বপ্রক্রীড়াপরিণতগজের ন্যায়, আর এখানে চিত্রকূট শৃঙ্গাগ্রে মেঘরূপ বপ্রপঙ্কলগ্ন দৃপ্ত বৃষভের মত। দুই স্থলেই মেঘ ও বপ্রক্রীড়ার কথা রহিয়াছে। চিত্রকূটে যে মেঘের খেলা হয়, কালিদাস রঘুবংশে তাহা বলিতেছেন। রামগিরিতে তাহা ভাল করিয়াই বলিয়াছেন। রঘুবংশে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকের কথা না থাকিলেও, মন্দাকিনীর কথা বলিতে কালিদাস বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ।†—(রঘু, ১৩-৪৮)।

নির্মল নিস্পন্দ প্রবাহে দূরে অবস্থান হেতু কৃশা বলিয়া প্রতীয়মানা মন্দাকিনী নদী চিত্রকূটের উপকণ্ঠে ভূমির কণ্ঠগতা মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। চিত্রকূটের ছায়াতরুতলে যে রামসীতা অবস্থান করিয়াছিলেন, কালিদাস রঘুবংশে তাহাও বলিয়াছেন,—

"সসৈন্যশ্চাগরাদাম্ং দর্শিতাশ্রমালয়ৈঃ।
তস্য পশ্যন্ সসৌমিত্রেরুদশ্রুর্বসতিদ্রুমান॥ — রঘু, ১২-১৪)।

আশ্রমবাসীদের দর্শিত সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বসতিদ্রুম সকল দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভরত সসৈন্যে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন,—

"প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম।
কদাচিদঙ্কে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ॥"—(রঘু, ১২-২১)।

কখনও কখনও আপন প্রভাবে ছায়া স্তম্ভিত করিয়া বনস্পতির তলে সামান্য শ্রমের পর রামচন্দ্র সীতার অঙ্কে শয়ন করিতেন। সুতরাং রামগিরির স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুর সহিত চিত্রকূটের বসতিদ্রুম ও স্তম্ভিতচ্ছায়া বনস্পতির ঐক্য আছে কি না, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এক্ষণে রামগড় অপেক্ষা চিত্রকূটেরই রামগিরি হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা কি না, তাহাও সকলকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। বিশেষতঃ এই চিত্রকূটেই ভরত-সমাগম

* "ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ" কথায় রামায়ণের 'সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্' কথাটি মনে পড়িতেছে।

† "মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ" কথায় রামায়ণের 'কটিস্মিণিরিবাশোভ ম্' কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

হইয়াছিল। ভরত-সমাগম রামায়ণের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। কালিদাসও রঘুবংশে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই চিত্রকূট যে তাঁহার রামগিরি, তাহাই মনে হয়।

মেখলায় অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নের কথা রামায়ণে নাই, রঘুবংশেও নাই। কেবল তাহা মেঘদূতেই আছে। এক্ষণে তাহা কোন পর্ব্বতের মেখলায় দেখিতে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না। কালিদাসের সময় রামগিরির মেখলায় হয় ত ঐরূপ কিছু চিহ্ন ছিল, নতুবা কালিদাস তাহার উল্লেখ করিবেন কেন? সে যাহা হউক, চিত্রকূটের পরিক্রমপথে চরণপাদিকা নামক মন্দিরে এখনও রামসীতা ও লক্ষ্মণের পদচিহ্ন দেখান হইয়া থাকে। অবশ্য রামগড়েও দুইটী পদচিহ্ন দেখায়। কিন্তু তাহাতে পরিক্রমের কোন কথা নাই। এই পরিক্রম হইতেই গিরিমেখলায় অঙ্কিত পদচিহ্ন বুঝিয়া লইতে পারা যায়। চিত্রকূটে এখনও অনেক তীর্থে যাত্রীরা স্নানও করিয়া থাকে।‡

এক্ষণে একটী কথা উঠিতে পারে যে, কালিদাস মেঘকে বরাবর উত্তরমুখে অলকায় না পাঠাইয়া, এত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন কেন? শাস্ত্রী মহাশয় সে কথার উত্তর দিয়াছেন। আমরাও তাহাই মনে করি। কবির প্রিয়ভূমিগুলি দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি রঘুবংশে পুষ্পকরথকে যে দিক্ দিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা না করিয়া মেঘদূতে মেঘকে অন্য পথ ধরাইয়া দিয়াছেন। রঘুবংশের পুষ্পকের পথ রামায়ণের বর্ণিত স্থান। কিন্তু মেঘদূতের মেঘের পথ কবির নিজের সৃষ্টি। কাজেই কবি আপন ইচ্ছায় মেঘকে চালাইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় রঘুবংশের পর মেঘদূত রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, যদিও কেহ কেহ রঘুবংশের পূর্ব্বে মেঘদূতের রচনা বলিয়া থাকেন।§ রঘুবংশে কালিদাসকে কতকটা পরনির্ভরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, কিন্তু মেঘদূতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। পূর্ণ স্বাধীনতার পর পরনির্ভরতা আসে না। সে যাহা হউক, মেঘদূতে কালিদাস স্বাধীনভাবেই আপনার কল্পনাকে চালিত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি রামগিরি বা চিত্রকূট হইতে মেঘকে অমরকণ্টকে লইয়া গিয়াছেন। অবশ্য যক্ষ তাহাকে একটু পিছাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু পরে উত্তরে যাইতে বলিয়াছে। আমাদের চক্ষে চিত্রকূট ও অমরকণ্টকের ব্যবধান নিতান্ত

‡ "Foot-prints of Rama, Sita and Lachhman are still shown at a temple called Charanpadika on the Parikrama * * * There are 33 places of worship, dedicated to various deities, situated on the low surrounding hills on the banks of the Paisuni and in the valley and plains at the foot of the hill, all of which are connected with the ceremonies performed at Chitrakot Of these places, seven, named Kot-tirth, Diwanganga, Hanuman Dhara, Phataksila, Answiya, Gupt Godawari and Bharat-Kup, are those most frequented by devout Hindus, who go through the ceremonies of bathing and meditation at each of them."—The Traveller's Companion—compiled by Abdur Rasheed, Librarian, under the orders of the Railway Board—Chitrakot

§ S C. De, Kalidasa and Vikramaditya

অল্পবোধ না হইলেও, মেঘের নিকট—বিশেষতঃ যাহাকে অলকায় যাইতে হইবে, তাহার কাছে যে তাহা 'কিঞ্চিৎ', তাহাতে সন্দেহ নাই। অমরকণ্টক হইতে মেঘ সোজা উত্তরে গেলে, আবার সেই প্রয়াগ অযোধ্যা। সেখান হইতে অলকায় যাইতে হইলে, পশ্চিমমুখে বাঁকিয়া যাইতে হইবে। তাই কবির প্রিয় স্থানগুলি দেখাইবার ছলে তিনি অমরকণ্টক হইতে মেঘকে উত্তরমুখে যাইতে বলিয়া, বক্রভাবে পশ্চিম দিক্ ধরিয়া উত্তরমুখ হইয়া যাইতে বলিতেছেন। আর বর্ষার বাতাস মেঘকে পশ্চিমে ঠেলিতে ঠেলিতেও লইয়া যাইবে। তাই অমরকণ্টক হইতে মেঘ বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা দেখিয়া একেবারে পূর্ব্বমালবে গিয়া পড়িবে। এই মালবপ্রদেশই প্রধানতঃ কবির প্রিয়স্থল। তাই সেখানকার বিদিশা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেখাইবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তবে বিদিশা, উজ্জয়িনী প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অমরকণ্টক, নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যপ্রীতি কেন হইল, এরূপ একটী কথা উঠিতে পারে। কেন হইল, এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে কালিদাসের যে বিন্ধ্যপ্রীতি ছিল, তাহা কেবল মেঘদূতে নহে, তিনি অন্যান্য স্থানেও তাহা দেখাইয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে "বিদ্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যাম্", রঘুবংশে "বিন্ধ্যস্য মেঘপ্রভবা ইবাপঃ" এবং ঋতুসংহারের—

"জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈ-
রয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ
সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্॥—(ঋতু, বর্ষা, ২৭)।

এইরূপ বর্ণনা হইতে কালিদাসের যে বিন্ধ্যপ্রীতি ছিল, তাহা বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, কালিদাস প্রথম বয়সে বিন্ধ্যপ্রদেশেই ঋতুসংহার রচনা করিয়াছিলেন।* আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি, যদিও নানা স্থানে কালিদাসের জন্মভূমি স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে,† অমরকণ্টকে যে তিনি জন্মিয়াছিলেন, এরূপ একটা কথাও প্রচলিত আছে।‡ ইহার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে কালিদাসের বিন্ধ্যপ্রীতির কারণ অবশ্য বুঝা যাইতেছে। আর চিত্রকূট হইতে আম্রকূটে মেঘকে লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যও বুঝা যায়। আমরা তখন দীনবন্ধুর সেই কবিতাটি মনে করিতে পারি,—

* S. C. De, Kalidasa and Vikramaditya.

† মালব, বাঙ্গলা, কাশ্মীর, মধ্যদেশে, কালিদাসের জন্মস্থান লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। হয়ত কালিদাস ঐ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকিবেন। তাই আমাদের সেই ইংরাজী কবিতাটি মনে পড়ে,—

"Seven cities claimed for Homer dead
Through which living Homer begged his bread."

‡ "Amarkantak is also the birth-place of Kalidas, author of the famous poems of Meghdut and Amarikantak"—The Traveller's Companion—Amarikantak.

অমরীকণ্টক কাব্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

"পাক দিয়া বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম।"

সে যাহা হউক, কালিদাসের বিন্ধ্যপ্রীতিই যে মালবপ্রদেশের ন্যায় মেঘকে বিন্ধ্যপ্রদেশ হইতে ঘুরাইয়া মালবে লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চিত্রকূটকেই রামগিরি বলিয়া বোধ হয়। মল্লিনাথও তাহাই বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমরা রামগড়কে রামগিরি ধরিয়া লওয়ার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ভাষাতত্ত্বনিধি মহাশয় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এ পর্য্যন্ত নানা পত্রিকায় তাঁহার গবেষণালব্ধ বহু বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি সকল বঙ্গভাষানুরাগী, বিশেষতঃ বাঙালী-মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (তৃতীয় ভাগ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪) তাঁহার 'শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে (পৃঃ ২১০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তিনি আমার একখানি মহাভারত পুথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বাধ্য হইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত আমাকে এই আলোচনায় যোগ দিতে হইল। উক্ত পুথি দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণের যদি বিন্দুমাত্রও সহায়তা হয়, তবে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রারম্ভেই একটি কথা আমাকে জানাইয়া রাখা ভালো। বর্ত্তমান সময়ে আমার নিকটে মাত্র একখানি মহাভারতের পুথি আছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে আমি আরো সঞ্জয়-রচিত মহাভারত সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু আপাততঃ তাহা আমার সঙ্গে না থাকাতে পাঠ মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হইল না। কলিকাতা থাকিলে আরো বহু পুথি দেখিবার সুযোগ ঘটিত, কিন্তু তাহা হইতেও আমি বঞ্চিত। বর্ত্তমানে শান্তিনিকেতন হইতে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। এখানকার গ্রন্থাগার খুবই মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙলা পুথির সংগ্রহ এখানে নাই, এ কথা অনেকেই হয় ত জানেন। সুতরাং সমুদয় মন্তব্য আমাকে এই একখানি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করিয়াই লিখিতে হইল, হয় ত অপরাধ আমার অমার্জ্জনীয়।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে ভর্ত্তি হইবার পর ত্রিপুরা জেলায় প্রাচীন পুথি ও গীতিকার খোঁজ করিতে করিতে আমি সর্ব্বপ্রথম ইহার সন্ধান পাই। কিন্তু তখন ইহা সংগ্রহ করি নাই, অপ্রকাশিত ও সর্ব্বসাধারণের অজানা পুথি ও গীতিকা সংগ্রহেই আমি সেই সময়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আমার এই সময়কার সংগৃহীত পুথির মধ্যে সেক চান্দের ভণিতাযুক্ত 'রসুলবিজয়' নামক একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর পরীক্ষা ইত্যাদি শেষ হইলে পর আলোচ্য পুথিখানিকে প্রাচীন দেখিয়া (খণ্ডিত, অর্থাৎ অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত হইলেও আমি সংগ্রহ করি এবং কলিকাতা আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি। আমাদের

---

* ১৩৩৫।২১এ আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়েই পুথিখানি দেখেন এবং ইহা মূল্যবান্ মনে করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। তখন বসন্তবাবুর এই প্রবন্ধটি লেখা হইতেছে, সুনীতিবাবু আমাকে তাঁহার একখানি চিঠি পড়িয়া শোনান। আলোচ্য পুথি হইতে উপকরণ সংগ্রহে আমার আপত্তি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় আমি সানন্দে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করি। তখন সুনীতিবাবু সময় অভাবে তাড়াতাড়ি এই পুথি হইতে কয়েকটি ভণিতা লিখিয়া লয়েন, পরে হয় ত বসন্তবাবু তাঁহার নিকট হইতেই এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুনীতিবাবু ঐ সমস্ত ভণিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই বলিয়াই বসন্তবাবু কলিকাতা আসিলে আমাকে পুথিখানা লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু নানা কারণে তখন তাহা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত আছি।

শ্রদ্ধেয় বসন্তবাবু আমার পুথিখানিকে পরাগলী ভারত আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয় আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পুথিখানি খণ্ডিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইহার সকল পর্ব্ব একজনের রচিত নহে। আদিপর্ব্বে গঙ্গাদাস সেন, কবীন্দ্র এবং নিত্যানন্দ ঘোষ বলিয়া এক কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, যথা—

(১) গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।—(পৃঃ ৪ ক)

(২) গঙ্গাদাস কবি কহে রচিয়া পয়ার।
মহাভারথের কথা অমৃতের সার॥
ভারথের পুণ্যকথা সুনে একমনে।
নিত্য গঙ্গাস্নান হৈল কহিছে পুরানে॥
ব্যাশ মুনির বাক্যে পাণ্ডব বিজয়।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে অন্তে সর্গ হএ॥—(পৃঃ ৯ক খ)

(৩) ষষ্ঠীবরসুত সেন পদবন্দ সঙ্কেতন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার।—(পৃঃ ১০ক)

(৪) নিত্যানন্দ ঘোষে বোলে সুন সর্ব্বজন।
আগে এহি অষ্টাদস পর্ব বিবরণ॥—(পৃঃ ২৩ খ)

(৫) নিত্যানন্দ [ঘো]ষে বোলে নাহিক অন্যথা।
পাঁচালি কহিব সুন আদিপর্ব কথা॥--(পৃঃ ২৪ ক)

(৬) ভারথের পুণ্য
............লোকে হইবা নিস্তার॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শ্রীযুত লস্কর পরাগল খান।
অষ্টাদস ভারথ ..... ॥

তাহান আদেশমাল্য মাথে করি সার।
কবেন্দ্রে রচিলা পোথা ভব তরিবার॥[১] ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে আদিপর্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা। পুস্তক। শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং। (পৃঃ ৪৬খ)।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'[২] নিত্যানন্দ ঘোষ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—'নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক কবি সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই মহাভারতই পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সঞ্জয় যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদকারক, নিত্যানন্দ ঘোষও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সেইরূপ স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন।' কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গেও যে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারতের অংশবিশেষ পাওয়া যাইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আমার পুথির শুধু আদি, সভা ও অশ্বমেধপর্ব্বটি সঞ্জয়ের নহে, তা ছাড়া আর আর প্রায় সমস্ত পর্ব্বই সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত, এই সকল ভণিতার কয়েকটি মাত্র পরে উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত হইবে। দুই একটি পর্ব্বে মোটেই ভণিতা নাই, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বাপর পর্ব্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত বলিয়া একই কবির রচনা মনে করা হয় ত অসঙ্গত হইবে না। উদাহরণ-স্বরূপ অনুশাসন পর্ব্বটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তা ছাড়া আমার পুথিতে কবীন্দ্র-র চত অনুশাসন পর্ব্বও পৃথক পাওয়া গিয়াছে।

বসন্তবাবু সঞ্জয় ও পরাগলী ভারতের তুলনা করিয়া অবশেষে লিখিতেছেন,—' . অশ্বমেধ পর্ব্বের সমস্তটাই সঞ্জয়-ভারত পৃথক্। পরাগলী বা ছুটিখানী অশ্বমেধ পর্ব্ব সঞ্জয়-ভারতে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ষষ্ঠীবরসুত গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ পর্ব্বটি সঞ্জয়ভারতে সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে[৩]।' কিন্তু আমার পুথিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি,—অশ্বমেধ পর্ব্বটি শ্রীকর নন্দী বিরচিত।

আলোচ্য পুথি নকলের তারিখ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। অশ্বমেধ পর্ব্ব ১৬৩২ শকাব্দে শ্রীরাজারাম দত্ত নকল করিয়াছেন, পুথির মালিক শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মা[৪]। ইহা ভিন্ন সভাপর্ব্ব এবং শান্তিপর্ব্বের পরেও অন্য লিপিকরের তারিখ দেওয়া আছে[৫]। সভা-

১। এই পৃষ্ঠাটির অতি জীর্ণ অবস্থা, অনেক অক্ষরই উঠিয়া গিয়াছে। নিঃসন্দেহে যাহা পড়া যায়, তাহাই উদ্ধৃত হইল।

২। পৃঃ ৪২৩, চতুর্থ সংস্করণ।

৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩১৪, পৃঃ ২০৯।

৪। যথা—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে অশ্বমেধ পর্ব। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিরপি মতিভ্রমঃ যথা দৃষ্ট তথা লিখীতং। লেখকে নাস্তি দোস। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩২ তেরিখ ২০ কার্ত্তিক রোজ বুধবার দিবা আদ প্রহর। লিখিতং শ্রীরাজারাম দত্ত স্বাক্ষরমিদং। পুস্তকং শ্রীশিবরাম দেবসংনস্ত।

৫। সভাপর্ব্বের পরে—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে দ্বিতীএ সভাপর্ব সমাপ্ত। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৫৯। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা। শ্রীরামদেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং।

পর্ব্ব এবং শান্তিপর্ব্বের তারিখ কিছু পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই—কিন্তু আদিপর্ব্বের লেখকও শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা এবং তাহার মালিকরূপে শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মার নামই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, কামদেব হয় ত শিবরামেরই পুত্র অথবা নিকট আত্মীয় কেহ হইবেন। সুতরাং মোটামুটিরূপে আমরা পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিতেছি।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিজয় পণ্ডিত-(?) রচিত মুদ্রিত মহাভারতের মুখবন্ধে সরলতা ও সংক্ষিপ্ততার জন্য ইহাকে আদি মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই[৬]। বসন্তবাবুও এ বিষয়ে আপত্তি তুলিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন,—'সংক্ষিপ্ত হইলেই কাব্যখানিকে আদিকাব্য এবং বিস্তারিত ও বৃহদায়তন হইলেই তাহাকে সেই আদি-কাব্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? লঘুকৌমুদী ত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ নহে, লঘুভাগবত গ্রন্থ ভাগবত গ্রন্থের মূল নহে, বাল্মীকির রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অথবা ব্যাস-মহাভারত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের বিকাশ নহে। * * * ইহা হইতে দুইটি অনুমান মনে আসে—প্রথম বড়টি ছোটটির বিকাশ, অথবা দ্বিতীয় ছোটটি বড়টির সংক্ষেপ[৭]।' আমরা এই যুক্তি সমর্থন করি। কিন্তু তিনিই আবার পরে লিখিতেছেন,—'মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা সঞ্জয়ভারতে কিছু বেশী কথা আছে, ইহাকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যায়[৮]।' ইহাতে পূর্ব্বাপর যুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কি? কিন্তু ইহারও বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাব নাই। দীনেশবাবু সঞ্জয়ের মহাভারতকে অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকটি পর্ব্বের পত্রাঙ্ক তাঁহার সহিত আমার প্রায় মিলিয়া যাইতেছে। আমার পুথিতে কবীন্দ্র ও সঞ্জয়, উভয়েরই অনুশাসন পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তুলনা করিয়া দেখিলাম, কবীন্দ্রের অনুশাসন পর্ব্ব সঞ্জয় অপেক্ষা বৃহৎ।

বসন্তবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ৪খানি (১৫৫০ সংখ্যক, ৮৫৬ সংখ্যক, ৮৬৫ সংখ্যক ও ৯৬৭ সংখ্যক পুথি) সঞ্জয়-মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একমাত্র ৮৫৬ সংখ্যক পুথিখানার লিপিকাল আমাদের জানাইয়াছেন[৯]। উক্ত পুথি-খানার তারিখ ১২১৭।১০ ফাল্গুন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা যদি বঙ্গাব্দ হয়, তবে পুথিখানা কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের প্রাচীন মাত্র। তাঁহার পুথি হইতে আমার পুথি যে প্রাচীনতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুথি যতই অপ্রাচীন হইবে, 'জয়গোপালগণ' ততই ইহার পাঠ বিকৃত ও পরিবর্দ্ধন করিতে সুবিধা পাইবেন, ইহা তো অতি সহজ কথা। বিশেষতঃ পরাগলী

শান্তিপর্ব্বশেষে—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজএ চতুর্দ্দশে শান্তিপর্ব্বঃ সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মণঃ। পুস্তক শ্রীকামদেব দেবশর্ম্মা। ইতি সন ১০৩৯।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৩৫, চতুর্থ সংস্করণ।

৭। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ১৭২।

৮। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২০৯।

৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২০৭।

ভারত হইতে সঞ্জয়-ভারতের প্রচার যে অনেক বেশী, তাহা বসন্তবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণেও তাঁহার সঞ্জয় ভারত বিপুলায়তন হওয়া বিচিত্র নয়।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারতে যে ধৃতরাষ্ট্র-সহচর সঞ্জয় আছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কবিই এই সন্দেহ রাখিতে দেন নাই। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ-বিবরণ বলিবার নিমিত্ত এই সহচর সঞ্জয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই উপাখ্যান আমরা ভীষ্মপর্ব্ব হইতে কবির রচনাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

পাণ্ডব কৌরব তবে সময় করিল।
ধর্ম্ম অনুশারি যুদ্ধ সন্ধান করিল॥
নির্বহিল যুদ্ধকাল হৈল অবসান।
পরস্পরে করিব সৌহার্দ্দ সন্নিধান॥
বনে বনে বিচারিয়া চাহিব কুতূহল।
বিপক্ষ করিয়া তাত না করিব ছল॥
বাক্যযুদ্ধে না করিব অস্ত্রের প্রহার।
অশ্ববার সমে জুঝিবেক অশ্ববার॥
গজে গজে জুঝিবেক পদাতি পদাতি।
রথে রথে জুঝিবেক ধর্ম্মযুদ্ধ অতি॥
বোলাইয়া জুঝিবেক না জুঝি অজ্ঞাত।
জে জন বিকোল অস্ত্র না করিব তাত॥
বিশ্বাসিয়া না মারিব না মারিব সুত।
হিন জন না মারিব না মারিব দুত॥
এক সনে যুদ্ধ দিতে না মারিব আনে।
না মারিব বিমুখ সরণ লএ জনে॥
হিন জন না মারিব কবচবর্জ্জিত।
ভার বহে জন না মারিব কদাচিত॥
জে জনে যোগাএ অস্ত্র তাহাকে না মারি।
না মারিব জত জনে বাহে সংখ ভেরি॥
এহি মত সমবায় করি দুই বলে।
সংগ্রামেত প্রবেসিল মন কুতুহলে॥
ধৃতরাষ্ট্রের ইছা হৈল যুদ্ধ দেখিবারে।
হেন যুদ্ধ দেখিতে জে না দিল আন্ধারে॥
পাণ্ডব কৌরবগণ রণেতে নিধন।
জানিয়া আইল ব্যাশ মুনি তপোধন॥

ব্যাশদেব আইল জদি রাজার দুয়ারে।
দ্বারি গিয়া জানাইল রাজার গোচরে॥
দ্বারি বোলে আসিআছে ব্যাশ তপোধন।
জানাইতে আইল মুই তোহ্মার চরণ॥
ই কথা সুনিয়া রাজা বলিল দ্বারিরে।
সত্বরে মুনিরে গিয়া আন অন্তঃপুরে॥
রাজার আজ্ঞাএ মুনি গেল পুরি মাঝে।
পাদ্য অর্ঘ আচমনি দিয়া মুনি পুজে॥
চরণে পড়িয়া স্তুতি করিল বিস্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া বলিল তদন্তর॥
দুর্য্যোধনে না সুনিল তোহ্মার জে বোল।
তে কারণে ক্ষয় হৈল মোর দুই কুল॥
ধৃতরাষ্ট্রে চিন্তএ পুত্রের বিসম্বাদ।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করএ বিশাদ॥
হেন কালে ব্যাশ মুনি রাজাতে কহিল।
আজি হোতে কুরুবংশ নাস পাইল॥
কাল অভিপ্রায় আজ অনিত্য সংশার।
বিশাদ না কর চিত্যে সুন মহাভার॥
পুত্র সব তোহ্মার জতেক অপচয়।
পরস্পরে মারিয়া সমরে হৈব ক্ষয়॥
যুদ্ধ দেখিবারে জদি অভিলাস হএ।
সাবধান হইয়া রাজা চাহিবা নিশ্চয়॥
দেখিবার ইচ্ছা মোর নাহিক নয়ন।
জ্ঞাতি মিত্র সুহৃদ পড়িব বন্ধুজন॥
প্রনমিয়া ধৃতরাষ্ট্রে সকরণে কহে।
জ্ঞাতির দরসন হৃদএ না সহে॥
তোহ্মার প্রসাদে মুই সুনিব শ্রবণে।
ই বলিয়া নরনাথ পড়িল চরনে॥
ব্যাশে বোলে দীব্য চক্ষু পারিএ দিবার।
দেখিবারে ইচ্ছা জদি থাকএ তোহ্মার॥
অন্ধরাজা বোলে দুই কুল নাস হৈব।
দেখিবারে সক্য নহে কেমতে দেখিব॥

হেন জন আজ্ঞা কর মোর প্রতি বাপ।
প্রতিদিন মোতে কহে যুদ্ধের প্রস্তাপ॥
ক্ষেনেকে চিন্তিয়া তবে ব্যাশ তপোধন।
সঞ্জএরে দিল বর দীব্য দরসন॥
রাজাকে বোলএ তবে ব্যাশ তপোধন।
তাহাতে সুনিবা জত যুদ্ধের কথন॥—(পৃঃ ১৩৬ খ ও ১৩৭ ক, খ)

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক পর্ব্বেই সহচর সঞ্জযের উল্লেখ মিলে, কিন্তু সেগুলি যে ভণিতা নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যথা,—

(১) এতেকে জানিলুন দুর্য্যোধনের নাই জয়।
তার পাছে কি হইল কহরে সঞ্জয়॥
সঞ্জএ বোলএ রাজা তোহ্মা বুদ্ধি দোষে।
অধর্ম্মে বিকল চিত্ত চিন্তিবা জে শেষে॥ ইত্যাদি। (পৃঃ ১৪৯)

(২) ধৃতরাষ্ট্রে বোলে তবে কহরে সঞ্জয়।
তোহ্মার কথা সুনি। মনেতে লাগে ভয়॥

*　*　*　*

সঞ্জএ বোলএ রাজা এহি দুইজন।
পাণ্ডববংশেত জন্ম অর্জ্জুননন্দন॥
তোহ্মার পুত্রের কুবুদ্ধি হইল পাষা খেড়ি।
যুধিষ্ঠির রাজা গেল রাজ্যধন এড়ি॥ ইত্যাদি।
(পৃঃ ১৫০ খ ও ১৫১ ক)

(৩) ধৃতরাষ্ট্রে বোলে তবে কহরে সঞ্জয়।
তবে কোন মত হৈল কহ মহাসয়॥
সঞ্জএ বোলএ রাজা সুন সাবধানে।
বিবেচিয়া কহি সুন তোহ্মা বিদ্যমানে॥ ইত্যাদি। (পৃঃ ১৫২ খ)

কয়েক স্থানে সঞ্জয় শব্দ দ্ব্যর্থবোধক, ইহাও সত্য। যেমন আমার পুথিতে,—

(১) হানাহানি কাটাকাটি বান বরিসন।
সঞ্জএ কহিলা ভীষ্ম পর্ব্বের কথন॥—(পৃঃ ১৫৩ ক)

(২) অষ্টম দিনের রণ ভীষ্ম পর্ব্বএ।
জয়মুনি কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥—(পৃঃ ১৫৫ ক)

(৩) ভীষ্ম পর্ব্বে রাত্রি শেষে ইসব কথন।
সঞ্জএ কহিল সপ্ত দিন বিবরণ॥—(পৃঃ ১৫৭ ক)

(৪) নবম দিবসের রনে ভিষ্মেব হৈল ভঙ্গ।
সঞ্জএ কহিল ভিষ্ম পর্ব্ব নানা রঙ্গ ॥—(পৃঃ ১৬৪ খ)

(৫) দ্রোণ পর্ব্ব মহা পোথা কৌতুক প্রচুর।
সঞ্জএ কহিল তাকে বডহি মধুব ॥—(পৃঃ ১৮৫ ক)

কিন্তু ইহা ভিন্ন সঞ্জয়েব প্রকৃত ভণিতাও দুর্লভ নহে। বসন্তবাবু সঞ্জয়েব কযেকটি দ্ব্যর্থবোধক ভণিতা ও ধৃতবা্‌ট্র-সহচবেব কথা উদ্ধৃত কবিয়া বলিয়াছেন,—'এগুলি প্রকৃত ভণিতা নহে। ইহাব উপব কবীন্দ্র বা শ্রীকবেব ভণিতা পৃথক্ আছে[১০]।' প্রমাণস্বরূপ আমাব পুথির কথা উল্লেখ কবিয়া পাদটীকায় বলিতেছেন,—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাব একজন কুমিল্লাবাসী ছাত্রব আনীত একখানি পরাগলী ভাবতেব পুথিতে কবীন্দ্র ও সঞ্জয়েব ভণিতা একত্র পাইয়াছেন। আমাব পুথিগুলিতেও তাহাই পাইতেছি। তবে তাঁহাব পবাগলী ভণিতাগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত আকাবে লিখিত দেখিলাম[১১]।' কিন্তু মোটেই তাহা নহে। আমাব পুথিতে কোথাও কবীন্দ্র বা সঞ্জয়েব ভণিতা একত্র নাই। বসন্তবাবুর পুথিব ন্যায় আমাব পুথিতে সঞ্জযেব ভণিতাব উপবে কবীন্দ্র বা শ্রীকবেব ভণিতাও পৃথক্ পাওয়া যাইতেছে না। প্রমাণস্বরূপ আমাব পুথি হইতে কয়েকটি মাত্র ভণিতা উদ্ধৃত হইল, বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিতে বিবত হইলাম।

(১) ভিষ্ম পর্ব্বে অভিমন্যু দেখিয়া বিক্রম।
পয়াবে সঞ্জএ কহে পোথা জে সুগম ॥—(পৃঃ ১৪৫ ক ও খ)

(২) ভিষ্ম পর্বে ভগদত্ত ভিমেব জে যুদ্ধে।
সঞ্জএ কহিল তবে পয়াব প্রবন্ধে ॥—(পৃঃ ১৪৮ খ)

(৩) চতুর্থ দিনেব বণ ভিষ্ম পর্বণি।
সঞ্জএ বচিয়া বহে তাহাব কাহিনী ॥—(পৃঃ ১৪৯ ক)

(৪) তবে পলাইয়া গেল দুই মহাবথী।
সংশাব ভবিয়া বৈল অর্জ্জুনের কীর্ত্তি ॥
ভিষ্ম পর্বে দ্রোণ অশ্বথামা পরাজয়।
পাচালি সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৬৩ ক)

(৫) প্রথম দিবসে যুদ্ধ দ্রোণ পর্ব্বএ।
লোকে বুঝিবারে কথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৮৬ খ)

(৬) দ্রোণ পর্বে পয়াব সমব অর্জ্জুনের।
সঞ্জএ কহিল কথা কথা সঞ্জএর ॥—(পৃঃ ১৮৮ খ)

১০। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃ. ২১০।

১১। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২১০ পাদটীকা।

(৭) ঘোটক ধ্বজের ভেদ দ্রোণ পর্বএ।
সঞ্জএ কহিল কথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৯৩ ক)

(৮) দ্বিতীয় দিবস যুদ্ধ দ্রোণ জে পর্বএ।
সঞ্জএ গাঁথিল পোথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৯৮ খ)

(৯) করুণাসাগর কথা দ্রোণ জে পর্বএ।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জএ ॥—(পৃঃ ২১১ খ)

(১০) দ্রোণ পর্বে কহিলেক জয়দ্রথ বধে।
সঞ্জএ বুঝাএ লোক পয়ার প্রবন্ধে ॥—(পৃঃ ২১৮ ক)

(১১) ব্যাসের চরিত্র এহি দ্রোণ পর্ব কথা।
পাঁচালি সঞ্জএ কহে সঞ্জএর কথা ॥—(পৃঃ ২৪২ ক)

(১২) পঞ্চম দিনের রণ দ্রোণ জে পর্বএ।
ভবের তবণী নৌকা করিল সঞ্জএ ॥—(পৃঃ ২৬৬ খ)

(১৩) এক লক্ষ শ্লোক মহাভাবত সংহিতা।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা ॥
সাবধানে ধর্ম্মকথা বুঝাইবার তরে।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়াবে ॥—(পৃঃ ২৭১ খ)

(১৪) অতি অন্ধকার মহাভারথ সাগর।
পাঁচালি সঞ্জএ তাকে করিল উজ্বল ॥—(পৃঃ ২৮৪ ক)

(১৫) রুদ্রের কৌতুকস্থান দেখি সেইখানে।
প্রথম দিনের যুদ্ধ এই অবসানে ॥
সঞ্জএ কহিল এহি প্রথম দিবসে।
বিচিত্র পাঞ্চালি রচিল অনাআসে ॥—(পৃঃ ২৮৮ খ)

(১৬) নবনাবায়ণ দুই রণে কুতুহল।
সঞ্জএ ভাবথ কথা কহিল সকল ॥—(পৃঃ ৩২৫ খ)

(১৭) সঞ্জএর কথা শুনি সঞ্জয় বচিল পুনি।[১২] —(পৃঃ ৩৪৬ খ)

(১৮) ভারথ মাণিক্য নিধি আছিল অপার।
সঞ্জএ বেকত কৈল সরস পয়ার ॥—(পৃঃ ৩৭১ ক)

(১৯) মহামুনি ব্যাসে কৈল ভারতের পোথা।
নির্ম্মল সরিরে রাজা স্তুনে সর্ব্ব কথা ॥
সার ভারথের কথা কৈল ব্যাশ মুনি।

১২। এই পৃষ্ঠাটির অতি জীর্ণ অবস্থা, তার উপর আবার অর্দ্ধেক নাই। এই ভণিতাটি এবং অন্য কিছু অতি কষ্টে পড়া যায়।

সঙ্কেতবচন চন্দ্রবংশের কাহিনী ॥
ভারথেব পুণ্যকথা অমৃতলহরি।
পুণ্যবন্ত জনে সুনে কর্ণঘট ভরি ॥
ব্যাসেব মুখের কথা করিল প্রকাস।
দীব্য কথা ভারথেব সুনিলে পাপ নাস ॥
পুবান ভারথে জেবা সুনি থাকে কথা।
ভাবথ সুনিতে না কহিব অন্য কথা ॥
ভারথ সুনিতে জেবা অন্য কথা কহে।
পাপ দায় বাঢে কাম পুণ্য নাস হএ ॥
তথাপি মনের বাঞ্ছা বড পাম আস।
বাঁমন হইয়া জেন চন্দ্র অভিলাস ॥
দারিদ্র পুরুষে জেন ধন আসা কবে।
অপুত্রা জনেব আসা পুত্র পাইবাবে ॥
জত কিছু কহি সুন মনের বাঞ্ছিত।
না লইবা দোষ ইহাব সুনবে পণ্ডীত ॥
ভারথের কথা জেই সুনে মন করি।
সেই জনে সর্ব্বভাবে জাইবা বিষ্ণুপুবি ॥
কলি ভব আঘাব তরিবা নিঃসংশয়।
হবিব চরণে গতি বোলেন সঞ্জয় ॥[১৩]—(পৃঃ ৩৯০ক)

একটি ভণিতা যে একাধিকবাব পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে ; এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে 'সঞ্জএ কহিল কথা কহিল সঞ্জয়' ভণিতাটি উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। দীনেশবাবুর উদ্ধৃত সঞ্জয়ের ভণিতাব সহিত আমাব সঞ্জয়ের ভণিতা যে অধিকাংশে একপ্রকার, তাহা হয় ত সকলে লক্ষ্য কবিয়াছেন।

বসন্তবাবু লিখিয়াছেন,—'* * বিজয়পাণ্ডবকথা কোনও গায়কবিশেষের হস্তে অতিরিক্ত সংযোজন দ্বাবা বিপুলায়তন সঞ্জয়-মহাভাবতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে সেই গায়ক বা সঙ্কলনকর্ত্তা সঞ্জয়নামাও হইতে পাবেন, অথবা অজ্ঞাতনামাও হইতে পারেন। তবে প্রথমে নামহীন সঙ্কলনটিতে উত্তর কালে পৌবাণিক সঞ্জয়েব নাম জুড়িয়া দিয়া ধর্ম্মগ্রন্থখানিব উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সম্পাদনও গায়কেব অভিপ্রেত হইতে পারে[১৪]।' কিন্তু উপরে উদ্ধৃত ভণিতাসমূহ হইতে কি প্রমাণ হয় না যে সঞ্জয় বলিয়া একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি

১৩। সঞ্জয়ের ভণিতার মধ্যে একমাত্র এইটিই বড়।

১৪। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২১২।

অতি অন্ধকার অপার ভারতসাগর উজ্জ্বল করিয়া লোকহিত সাধন করিয়াছেন, সাবধানে ধর্ম্মকথা বুঝাইবার জন্য অনায়াসে মধুর পয়ার রচনা করিয়াছেন ?

মাত্র দুইটি সন্দেহজনক ভণিতা আমার পুথিতে পাওয়া যাইতেছে, যথা—

(১) জেমত ভারথকথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোকে মোহিত হৃদয় ॥—(পৃঃ ৩১৬ ক)

(২) সঞ্জএ বোলএ মহাভারথের সার।
গীত বুঝি বুঝি লোকে চাহে তবিবার ॥—(পৃঃ ৩১৯ খ)

কিন্তু ইহা বসন্তবাবুর যুক্তির পোষকতা করিতেছে কি না, তাহা বিচার্য্য।

শুধু সঞ্জয় ও পরাগলী ভারতে যে ভাষার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু বলিতেছেন,—'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়াও সঞ্জয়-রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী ভারতানুবাদগুলি রচিত হইয়াছিল[১৫]।' এই ভাষা-সাদৃশ্যের কারণ সম্বন্ধে বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ কিছু না দিতে পারিলেও তিনি একটি অনুমান করিয়াছেন। তাহা তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত হইল,—'মাগধ ভাটগণ প্রাচীন কাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তুতি-প্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন, এখনও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন, যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে[১৬]।' কিন্তু পরাগলী ও সঞ্জয়-ভারতের অভাবনীয় সাদৃশ্য বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় 'অজ্ঞাতকুলশীল কবিবিশেষ,' বসন্তবাবুর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর জন্য দীনেশবাবু যে পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নোক্ত দুইটি ছত্র নাকি পাওয়া গিয়াছে,—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারতকথা কহিলেক মর্ম্ম ॥[১৭] (৪৩৬ পত্র)

১৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৫।

১৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৫।

১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৯।

এই নিমিত্ত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে তিনি কবিকে বিক্রমপুরনিবাসী বৈদ্যবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করিলেও এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ নাই, তাহা স্বীকার করিয়াছেন[১৮]। বস্তুতঃ সঞ্জয়কে বৈদ্যবংশজাত বলিয়া মনে করিবার কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু তিনি যে ভরদ্বাজগোত্রীয়, সে প্রমাণ আমার পুথিতেও পাওয়া যাইতেছে, যথা—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জএ ভারথকথা কহে কুতুহলে ॥—(পৃঃ ২৮৫ ক)

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনুমান করেন, শ্রীহট্টই কবির জন্মভূমি, বিক্রমপুর নয়। এ বিষয়ে তিনি কি কি প্রমাণ পাইয়াছেন, বলিতে পারি না। সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সঞ্জয়রচিত মহাভারতের সভাপর্ব্বে তিনি নাকি—

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচিলা কৈল পাঁচালি প্রচার ॥

ভণিতা পাইয়াছেন। আজ এই বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে পারিলে আমরা সুখী ও কৃতার্থ হইব।

আমার পুথির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। পরাগলী মহাভারত ত্রিপুরা জেলায় মোটেই পাওয়া যায় না, তাহা নয়। আমার পুথির আদি (কিয়দংশ), অনুশাসন ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পর্ব্ব পরাগলী ভারতের।

বসন্ত বাবুর ন্যায় আমিও এই আলোচনার সার উদ্ধার করিয়া দিতেছি—যদিও তাঁহার সঞ্জয়-বিষয়ক প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়াই আমার মনে হইতেছে,—

১। ধৃতরাষ্ট্র-সহচর সঞ্জয়ের নামের সহিত সঞ্জয়ের ভণিতা কোন কোন স্থলে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই বাঙলা মহাভারতখানি সেই পৌরাণিক সঞ্জয়ের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে, এরূপ সন্দেহ অমূলক।

২। পরাগলী মহাভাবত ত্রিপুরা জেলায় পাওয়া যায় না, এমন কথা বলা হয় ত নির্ভুল নয়। সমগ্র মহাভারত না হোক, কয়েকটি পর্ব্ব যে পাওয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো হেতু নাই।

৩। ত্রিপুরার হিন্দুরাজার আশ্রয়ে পরাগল-সম্পর্ক-বর্জ্জিত এবং ভণিতাবিহীন 'বিজয় পাণ্ডবকথা' সম্ভবতঃ কোনো চতুর গায়ক কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া আপাততঃ কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। বসন্ত বাবুর অনুমান সত্য হইলে আমরা সঞ্জয়-ভারতে হয় ত সেই রাজাটির নাম পাইতাম।

৪। উত্তরকালে সংযোজনাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া 'বিজয় পাণ্ডবকথাই' বিপুলায়তন সঞ্জয়-ভারতে পরিণত হইয়াছে—ইহারও প্রমাণাভাব। আমার পুথিতে অশ্বমেধ পর্ব্বটি গঙ্গাদাস সেনের নয়—শ্রীকর নন্দীর।

১৮। বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৬০ ৭।

৫। সঞ্জয়-ভারতকে নিঃসন্দেহে পরাগলী ভারতেরই একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ এবং উত্তর-কালীয় বলা যাইতে পারে না।

৬। পরাগলী মহাভারত সঞ্জয়-ভারতের বিকাশ নহে, বরং সঞ্জয়-মহাভারত পরাগলীর বিকাশ বলিবার পূর্ব্বে প্রমাণ প্রয়োজন।

৭। সঞ্জয় অজ্ঞাত-কুলশীল কবিবিশেষ নহেন। তিনি যে ভরদ্বাজগোত্রীয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসুধীরকুমার সেন

বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন*

বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন কবা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গভাষাভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনাব জন্য একটী অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য।

আমাদের আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিব সৃষ্টিতে এই কয় প্রকাবেব উপাদান আসিয়াছে। **প্রথমতঃ, তদ্ভব** শব্দ : মুখ্যতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই আমাদেব ভাষা; ইহাদিগকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আর্য্যভাষাব নিজস্ব কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্য্যযুগে শব্দগুলি যেরূপে প্রচলিত ছিল, মুখে মুখে এক বংশপীঠিকা হইতে আব এক বংশপীঠিকায় ভাষাস্রোত যখন বাহিত হইয়া আসিতেছিল, এবং নানা অনার্য্য জাতিব মধ্যে এই আর্য্যভাষা যখন প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলি আব অবিকৃত থাকিতেছিল না, পুরুষপবম্পবা ধবিয়া পবিবর্ত্তিত হইয়া ভাষাব ইতিহাসেব গতি বা ধাবাব সঙ্গে যোগ বাখিয়া শব্দগুলি এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, সেই-গুলিকেই আধুনিক আর্য্যভাষাব নিজস্ব 'তদ্ভব' শব্দ বলা যায়। আধুনিক আর্য্যভাষাব বিভক্তি প্রত্যয়গুলিবও উৎপত্তি এইরূপে। তদ্ভব শব্দেব পবে ধবিতে হয়—দ্বিতীয়—**তৎসম** শব্দ, তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত-সম শব্দ। কথ্য বা মৌখিক ভাষাকে বহতা নদীব সঙ্গে তুলনা কবা যায়। প্রাচীন আর্য্যভাষাব বহতা নদী লোকমুখে নানা পরিবর্ত্তনেব মধ্য দিয়া চলিতে শুরু কবিল। পণ্ডিত-জন দেখিলেন যে, প্রাচীন আর্য্য বা বৈদিক বা ছান্দস ভাষা আব ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনেব মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পন্থী ভাষাও কেহ বলে না। ভাষাব গতি নিরোধ বা সংযমন অসম্ভব। তখন তাঁহারা মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ কবিয়া প্রাচীন সাহিত্যেব ভাষাব চর্চ্চায় ও ইহার বক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, ইহাব ব্যাকবণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যেব ভাষা 'সংস্কৃত' নামে খ্যাত হইল। মৌখিক ভাষাব গতি যে দিকেই যাউক না কেন, তাঁহারা সংস্কৃতেবই চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে পুরুষেব পর পুরুষ ধরিয়া পণ্ডিতেব আলোচনাব ও বচনাব মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষাবও গতি চলিল। মৌখিক ভাষা বহতা নদী,—সংস্কৃত তাহাব পাশে যেন কাটা খাল, ব্যাকবণেব দুই উঁচু পা'ড় অতিক্রম করিয়া চলে না। ভাষায় যে সমস্ত আদি যুগের আর্য্য শব্দ বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের অবিকৃত মূলরূপ সংস্কৃতেই রক্ষিতহইয়া আছে। আবশ্যক হইলে ভাষার পার্শ্বেই বিদ্যমান সংস্কৃত হইতে শব্দ ইচ্ছামত ভাষায় গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এই সব শব্দকে আধুনিক ভাষার 'তৎসম' শব্দ বলা হয়। আবার বহু স্থলে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ তাহাব বিশুদ্ধ রূপটী অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোকমুখে তাহারও বিকার ঘটিয়াছে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটী নূতন রূপ দাঁড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ

---

* ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ৩১এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

তদ্রূপ বিকৃত তৎসম শব্দের একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন—**ভগ্নতৎসম** বা **অর্দ্ধতৎসম** (semi-tatsama)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার গতিপথ অবলম্বন করিয়া, মূল শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে ভাবে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, দেখা যাইতেছে যে, অর্দ্ধতৎসমের উৎপত্তি সে ভাবে হয় নাই। আবার এমনটীও হইয়াছে যে মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিক-বার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের উচ্চারণরীতির দ্বারা অভিভূত হইয়া একাধিক অর্দ্ধতৎসম রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের তদ্ভব, তৎসম এবং নানা যুগে উদ্ভূত অর্দ্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ এক 'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারাই দেখানো যাইতে পারে। আদি আর্য্যযুগের ভাষায়, ধরা যাউক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০এ, 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কৃ-ষ্-ণ' রূপে অবিকৃত অবস্থায় ভারতবর্ষে আর্য্যভাষীদিগ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইত। কিন্তু এই অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল:—'*কর্-ষ্-ণ' '*কষ্ণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া '*কহ্ণ' এবং অবশেষ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে 'কণ্হ' রূপ ধারণ করিয়া বসিল। তখন শব্দটীকে আর আদিযুগের আর্য্য শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন মধ্যযুগের আর্য্য বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষাগত তাবৎ শব্দ যেখানেই একটু পরিবর্ত্তনসহ, সেখানেই এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে এই 'কৃষ্ণ > কণ্হ' শব্দ প্রাকৃত যুগের অবসানে আধুনিক আর্য্যভাষার যুগে, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে, 'কান্হ' ও পরে 'কান' আকার ধারণ করিয়াছে, তিন হাজার বছরে এইরূপে 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিণতি; এবং 'কান্হ' শব্দে আদরে '-উ' প্রত্যয় যোগে 'কান্হু' > 'কানু' রূপ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবন্ত শব্দ। ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্ণ' শব্দ বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত 'কণ্হ' রূপের পার্শ্বে, প্রাকৃত যুগে 'কৃষ্ণ' শব্দ গৃহীত হইল, কিন্তু প্রাকৃত-ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ '*কর্ষ্ণ', '*ক্রষ্ণ' '*ক্রষণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া অবশেষে প্রাকৃতে 'কসণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। 'কণ্হ' হইল তদ্ভব রূপ, 'কসণ' প্রাকৃতে আগত অর্দ্ধতৎসম রূপ। পরে যখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা 'কান্হ' শব্দ পাই তদ্ভব রূপ হিসাবে, এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অর্দ্ধতৎসম শব্দ হিসাবে পাই 'কসণ' ('কসণ ঘন গাজই', চর্য্যাপদ ১৬ = কৃষ্ণ ঘন গর্জ্জে)। তৎসম 'কৃষ্ণ' তো ছিলই। এই 'কসণ' শব্দ পরে বাঙ্গালায় অপ্রচল হইয়া পড়ে। সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দ আবার নূতন উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে মধ্য যুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অর্দ্ধতৎসম রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'*ক্রেষ্ণ', '*ক্রেষ্টঁ' প্রভৃতি মধ্য যুগের বাঙ্গালার সংস্কৃত উচ্চারণরীতির অনুমোদিত রূপের সরলীকরণের ফলে শেষে 'কেষ্ট' (='কেশ্টো') রূপ আসিয়া গিয়াছে। ও দিকে হিন্দীতে তদ্ভব রূপ 'কান্হ', 'কন্হৈয়া' (='কানাইয়া') বিদ্যমান আছে; তাহার পার্শ্বে আবার নবীন হিন্দী অর্দ্ধতৎসম রূপের সৃষ্টি হইল 'কিসন, কিসেন'; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নাম হিসাবে, মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া গেল—'কিষেণ' 'কিষণ' রূপে। অতএব আদি আর্য্য ভাষার 'কৃষ্ণ' শব্দ, তাহার দৌহিত্রীস্থানীয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই মূর্ত্তিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে,—

১। 'কান'—'কানু'—খাঁটী বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দ।

২। 'কসণ'—প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাকৃত হইতে লব্ধ অর্দ্ধতৎসম শব্দ, অধুনা লুপ্ত।

৩। 'কেষ্ট'—মধ্য যুগের বাঙ্গালায়, সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট অর্দ্ধতৎসম শব্দ। (হিন্দুস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ 'কিষ্টো' রূপে উচ্চারিত হয়)।

৪। 'কিষণ্', 'কিষেণ্'—হিন্দী হইতে উদ্ধারিত; হিন্দীর নিজস্ব অর্দ্ধতৎসম শব্দ 'কিসন্'এর বাঙ্গালা বিকার।

৫। 'কৃষ্ণ'—তৎসম শব্দ—উচ্চারণে যাহাই হউক, বানানে এটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ অবিকৃত রাখিয়াছে। (বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ 'ক্রিশ্ন' বা 'ক্রিশ্টঁ'; উৎকলে 'ক্রুশড়ঁ', হিন্দুস্থানে 'ক্রিশ্ন্' বা 'ক্রিশ্ড়ঁ')।

(১) তদ্ভব, (২) তৎসম, এবং **(২ক) অর্দ্ধতৎসম**—এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়া আধুনিক আর্য্যভাষাগত আর্য্য উপাদান; দেখা যাইতেছে, এই উপাদান হয় রিক্‌থরূপে আদি আর্য্যযুগের মৌখিক ভাষা হইতে প্রাপ্ত ('তদ্ভব' শব্দাবলী), নয় প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত হইতে ঋণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত ('তৎসম' ও 'অর্দ্ধতৎসম' শব্দাবলী)। ভাষাগত তৎসম শব্দাবলীর আলোচনা, আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি। অর্দ্ধতৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা করাও তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে, কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট হইয়া আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়। তদ্ভব শব্দ লইয়া অনেক স্থলে গোল নাই, 'কর্ণ> কণ্ণ> কান', 'চন্দ্র> চন্দ> চাঁদ', 'কার্য্য> কজ্জ> কাজ', 'সমর্পয়তি> সমপ্পেদি> সবঁপ্পেই> সঁপে', 'আবিশতি> আবিসদি> আইসই> আইসে> আসে' প্রভৃতি লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হয় না; আবার বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য একটু অনুসন্ধান করিয়া তবে তদ্ভব শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, 'এও < আইও < আয়্য < আইঅ < আইহ < আইহঅ < অইহব < অবিহবা, অবিধবা', 'সকড়ি, সঁকড়ি < সক্কডিআ < সঙ্কটিকা < সঙ্কট- < সং + কৃত', '√পর < পহ্র, পর্হ < পহির, পরিহ < পরি + √ধা', 'আয়ান < আইহণ < অহিঅন < অহিঅণ্ণ < অহিবণ্ণু < অভিমন্যু', 'দেরখো, দেউরখা < দিঅউরখা < দিঅরুখা < দীবরুক্‌খ- < দীপবৃক্ষ-'; ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা 'সাধু' ভাষায়, তদ্ভব ও অর্দ্ধতৎসম শব্দ শতকরা ৫১টার উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শতকরা ৪৪টা, আর বিদেশী শব্দ (ফারসী, পোর্ত্তুগীস, ইংরেজী) শতকরা ৪টার কিছু বেশী। কলিকাতার হিন্দু ভদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, শতকরা ১৭; বিদেশী শব্দ শতকরা ৩, এবং বাকী শতকরা ৮০টা তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম এবং অজ্ঞাতমূল শব্দ লইয়া।

বাঙ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়া বেশী ঝঞ্ঝাট নাই, সহজেই বা অনায়াসে তাহাদের মূল ফারসী বা ইংরেজী বা পোর্ত্তুগীস শব্দটীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র বাহির করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার তদ্ভব, তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে; সেগুলির মূল

নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও তেমনি সুপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এইরূপ শব্দ কিছু কিছু প্রাকৃতেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন দেশী। তাঁহাদের ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা আমরা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় প্রাপ্ত ঐ জাতীয় শব্দ সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি।

প্রথম, অনুকার শব্দগুলিকে দেশী পর্য্যায়ে ধরা হয়:—'চট্, সাঁ, টক্‌টক, থরথর, ছট্‌ফট্, হিজিবিজি' ইত্যাদি। কিন্তু অনুকার শব্দ ছাড়া অন্য পদার্থ বা ভাব বা ক্রিয়াবাচক বহু শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির পরে বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি বিকৃথ হিসাবেই প্রাকৃতের নিকট হইতেই বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,—এবং সংস্কৃতের বা আর্য্যভাষার ধাতু প্রত্যয় দ্বারা যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যেমন—√এড়,√নড়, টপক, পাড়া (=মহিষ), ঘোমটা, খেঁচি-(কড়ি), গাভী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, ঝাণ্ডা, ঝান্টু, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা, √চাটা, চোপ, পেট, কামড়, খোঁড়া, বঁইচি, ডাগর, চটী, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাসা, ডাব, ডিঙ্গা, ডিঙ্গান, ডোকলা, আড্ডা, গোড়া' প্রভৃতি। এইরূপ কতকগুলি শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা ভালো করিয়া করা যায় না। যেমন—'লাড়ু, থাড়ু > লড্ডুক, খড্ডুক'; 'তেঁতুল, প্রাচীন বাঙ্গালা তেন্তলী = সংস্কৃত তিন্তিড়ী', 'হাঁড়ী > হড্ডিক,' ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধু ভাষা পারতপক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু চলতি ভাষায় এইরূপ শব্দ শত শত মেলে। ইহাদের সংস্কৃত রূপ পাইলেও ইহাদের পূর্ণ সমাধান বিষয়ে আমরা 'হা'লে পানি পাই না'।

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিখিতে হইবে। ভাষা শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষাগত তদ্ভব, তৎসম, অর্দ্ধতৎসম, দেশী এবং বিদেশী সর্ব্বপ্রকার শব্দ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, বিদেশী ও তদ্ভব এবং অর্দ্ধতৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত হই না; familiarity breeds contempt: ইহাদের যেমন-তেমন বানান হইলেই হইল (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি বাদে অন্যথা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতারূপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে!)। ইহাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না বা দিই না, এ বিষয়ে আমরা আমাদের সহজ ভাষাজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু এক অঞ্চলে ব্যবহৃত তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম ও দেশী শব্দ রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে অন্য অঞ্চলের সেই সেই পর্য্যায়ের শব্দাবলী হইতে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি নূতন আগত, ইহাদের অপপ্রয়োগ বা অর্থপার্থক্য ততটা ঘটে নাই)। যাঁহারা এক অঞ্চলে জন্মিয়া সেখানকার ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্য অঞ্চলের কথিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে শিক্ষা বা অভিনিবেশের অভাবে,

যথার্থরূপে সক্ষম হন না। ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউক বা অনুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা আজকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, এমন কি, সাধু ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। এই ভাষা মূলতঃ অঞ্চল বিশেষের মৌখিক ভাষা, ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণরীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, নিজ মাতৃভাষাগত রিক্‌থ হিসাবে সমস্ত বঙ্গের সমগ্র শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী হইতে পারেন নাই। সেই জন্য অবিসম্বাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রশস্ত রাজমার্গস্বরূপ সাধু ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁহাদের অনেকে অনেক সময়ে বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন, তাহা তাঁহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর। আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিকের বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার ফলে, ঐ ভাষার তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম ও দেশী শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগরীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গদ্যের সাধু ভাষাই আদর্শ থাকায়, এতাবৎ খাঁটী বাঙ্গালাকে সাধু ভাষার আওতায় পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, সাধু ভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উপজীব্য ছিল, তাহার সন্ধিবিচ্ছেদ, ষত্ব ণত্ব-বিধান, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতিই ছিল একমাত্র ভাষাজ্ঞানের পথ—বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্ধি, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যয়ের কাজ, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস, অনুকার শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইত না। কারণ খাঁটী বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গদ্যের সাধু ভাষায় আইসে, সেইটুকুর পক্ষে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষাজ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জন্য ব্যাকরণের নিকট উপদেশ লইতে হইত।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিক্ষার জন্য ভাষার সকল রকমের উপাদানের চর্চ্চা আবশ্যক হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাময় উপাদান হইতেছে তদ্ভব ও দেশী উপাদান। একটা বড় বিষয়ে তদ্ভব উপাদানের (শব্দ ও প্রত্যয়াদির) আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে—সেটী সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অস্তিত্ব। দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই। ক্বচিৎ দুই চারিটী অনুরূপ প্রাকৃত শব্দ মেলে—যেমন, বাঙ্গালা 'চাঙ্গা'—প্রাকৃত 'চঙ্গ' = ভালো, বাং 'পেট'—প্রাকৃত 'পোট্ট'; মারহাট্টি 'তুপ'—প্রাকৃত 'তুপ্প'—ঘী; বাঙ্গালা ছট্‌ফট্ = প্রাকৃত 'চডপড', বাঙ্গালা 'চাটা' = প্রাকৃত 'চট্টি' ইত্যাদি। সংস্কৃতেও যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও খুব বিশেষ সহায্য হইল না, কারণ, অনেক স্থলে শব্দটির বা ধাতুটীর বাহ্য রূপেই সেটী যে আর্য্যভাষা বা খাস সংস্কৃতের শব্দ নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেগুলি বর্ণচোরা শব্দ বা ধাতু, তাহাদের

উৎপত্তি অন্যত্র, সংস্কৃতের সভায় কোনও রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবার চেষ্টায় আছে, যেমন 'তাম্বুল, লড্ডুক, খড্ডক, হড্ডিক, তিন্তিড়ী' প্রভৃতি শব্দ, যেমন 'খিট্ট, খট্ট, লোট্ট, গুণ্ড' প্রভৃতি ধাতু। বাস্তবিক পক্ষে এখন দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ বিস্তর 'দেশী' শব্দ সংস্কৃতেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং '-ক' বা তদ্রূপ অন্য কিছু প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত সাজিয়া বসিলেও, তাহারা আর্য্য পর্য্যায়ের শব্দ নহে। এইরূপ অ-ব্যাখ্যাত বা অ-জ্ঞাত মূল শব্দ বৈদিক ভাষায় তত প্রচুর নহে, কিন্তু পরের যুগের সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে দেখা যায়। দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আর্য্যভাষার একটী বিশিষ্ট উপাদান, মূলে যাহা আর্য্য নহে, তাহা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায়, এই তিনেই পাওয়া যায়। এই সকল দেশী শব্দের উৎপত্তি কি? প্রাচীন বৈয়াকরণিকদের প্রদত্ত 'দেশী' নামকরণ হইতে ইহাদের মূল সম্বন্ধে প্রাচীনেরা কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় না। 'দেশী' অর্থে প্রদেশনিবদ্ধ, যাহা কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাষায় বিদ্যমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতের সর্ব্বত্র গৃহীত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে না। 'প্রাদেশিক' শব্দ ব্যস্, এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। অনেক স্থলে তাঁহারা দেশী পর্য্যায়ে প্রাকৃতের বিস্তর তদ্ভব শব্দকেও ফেলিয়াছেন। যেমন 'হেট্‌ঠা' (অধস্তাৎ, * অধিস্তাৎ> *অধিষ্টাৎ> *অহেটঠা —হেটঠা = বাঙ্গালা হেঁট), 'অইবজুবই' (নববধূ অর্থে = অচিরযুবতী), 'সুবর্ণবিন্দু', 'অঙ্গবড্ডন', 'অম্বির' (= আম), 'অগ্‌গকৃথদ্ধ' ইত্যাদি।

দেশী শব্দগুলির ইতিহাস অনুশীলনে প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রাকৃতের বহু দ্রাবিড় দেশীয় ব্যাকরণকার ছিলেন। উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসীক, শক, ও দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক রোমানজাতীয় লোকেরা বহু কাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হয়তো দুই একজন ভারতীয় পণ্ডিত তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিয়া থাকিবেন, উত্তর-ভারতেও বহু স্থলে অনার্য্যভাষী জাতি আর্য্যভাষীদের পাশেই বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও না কোনও পণ্ডিতের হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল অ সংস্কৃত ভাষার বর্ণনাত্মক কোনও লেখা (দ্রাবিড় ভাষার দুই একখানি ব্যাকরণ ছাড়া) কেহ লিখিয়া যান নাই, ভারতে সুপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অন্যান্য অনার্য্য ভাষার আলোচনার পক্ষে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পক্ষে কার্য্যকর কোনও উপাদান প্রাচীন ভারতের কোনও লেখক দিয়া যান নাই। অথচ দ্রাবিড় ও কোলজাতীয় ভাষার এবং গ্রীক ও ঈরানী ভাষার প্রতিবেশ প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আর্য্যভাষা মুক্ত ছিল না। প্রাচীন যুগের কথ্যভাষা নানা প্রাকৃতে এই সকল ভাষ হইতে অনেক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতেও এই সকল শব্দ স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

আধুনিক যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আলোচনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সম্ভাব্য অনার্য্য

শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি নির্ণয়েব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমটায় সুসভ্য দ্রাবিড ভাষা তামিল, তেলুগু, কানাড়ীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয় বলিয়া আর্য্যভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদানের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আগে আকৃষ্ট হয়। কল্‌ডওয়েল, কিটেল, গুণ্ডার্ট্ প্রমুখ পণ্ডিতদেব আলোচনার ফলে অনেকগুলি সংস্কৃত ও অন্য আর্য্যভাষাগত শব্দের মূল যে দ্রাবিড ভাষায়, সে বিষয়ে আমরা সন্ধান পাইয়াছি। কিছু কিছু দেশী শব্দও এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সম্প্রতি আর্য্যভাষাব উপব কোল-জাতীয় ভাষাব প্রভাব লইয়া দুই জন ফবাসী ভাবত-বিদ্যাবিৎ আলোচনা আবম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদেব একজন পাবিসেব প্রাচ্যভাষাবিদ্যালয়ের আনামী ভাষাব অধ্যাপক, পালি সংস্কৃত কম্বুজীয়প্রমুখ ভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঝাঁ প্‌শিলুস্কি (Jean Przyluski), অন্য জন হইতেছেন, বিখ্যাত সংস্কৃত ও চীনাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Lévi)। পশিলুস্কি দেখাইয়াছেন যে, 'কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, (কুডি)' তাম্বুল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লগুড় (লগী) প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক আর্য্য-ভাষাগত) শব্দ মূলে প্রাচীন কালে কোলদেব অনুরূপ অনার্য্যভাষা বলিত, এমন জাতিব নিকট হইতে আসিয়াছে—যে জাতিব বংশধবেবা এখন আব অনার্য্যভাষা বলে না, আর্য্য-ভাষী ও হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যজাতি বাহিব হইতে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়া ভাবতে আসিল। এ দেশে দুইটি বিরাট জাতিব সহিত তাহাদেব সাক্ষাৎকাব ঘটিল—দ্রাবিড় ও কোল। ইহাদেব নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম্ম, সভ্যতা ও রীতিনীতি ছিল। নবাগত আর্য্যেবা সংখ্যায় ছিল কম। অনার্য্যেবা সংখ্যায় বেশী ছিল, এবং এই দেশেব উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাহিব হইতে আগত আর্য্যেবা পূর্ব্ব ঈবানে ও এই দেশে আসিয়া একেবারে নূতন অবস্থার মধ্যে পড়ে—নূতন দেশে নূতন প্রকাবেব জীব ও উদ্ভিদ্‌জগৎ, নানা নূতন ধরণের মানুষ ও তাহাদেব অদৃষ্টপূর্ব্ব রীতিনীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচাব-ব্যবহার। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সাধাবণতঃ ঘটিয়া থাকে—নবাগত বিজেতা আর্য্য ও বিজিত অনার্য্য দ্রাবিড় ও কোল—এই ত্রিবিধ জাতিব, তাহাদেব ধর্ম্ম সমাজনীতি, আচার অনুষ্ঠান প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভ্যতা—সকল বিষয়েই তাহাদেব জগতেব মধ্যে মিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আর্য্যধর্ম্ম ও সমাজ, যাহা আমবা বেদে পাই, তাহা পবিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্ম ও সমাজচিন্তায় পবিণত হইল। আর্য্যদেব দেবতাদেব সঙ্গে আপোষ কবিয়া লইয়া অনার্য্যদের দেবতাবাও পূজা পাইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ্য দেবতার মধ্যে তাঁহাদেব একটি বড়ো স্থান হইল। আর্য্যদেব ভাষা কিন্তু উত্তব-ভাবতে অনার্য্যদেব মধ্যে গৃহীত হইল, কিন্তু অনার্য্যভাষীদেব মধ্যে প্রসৃত হওয়াব ফলে, তাহাব আভ্যন্তরীণ রূপ, যাহা বাক্যরীতিকে অবলম্বন করিয়াও নানা খুঁটিনাটি বস্তুতে প্রকাশ পায়, তাহা বদলাইয়া গেল। আর্য্যভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তব রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠামো অন্য ধরণের হইয়া গেল; অনার্য্যভাষাব মবা গাঙ্গের খাত দিয়া আর্য্যভাষার ধাতু-শব্দরূপ জল বহিয়া চলিল।

অনার্য্যভাষার শব্দ যে এই অবস্থায় আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়াছে, এমন আর্য্যীকৃত অনার্য্যদের মধ্যে অনার্য্যভাষার শব্দ যে দু দশটা বহিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে ; এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই। বিশেষ ভাষাজ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। এই সব শব্দ, এতদ্দেশের বৈশিষ্ট্য নানা উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নাম লইয়া এবং এতদ্দেশের অনার্য্য লোকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া, এবং সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থবাচক নামও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল।

এই সমস্ত শব্দ দ্বারা ভারতীয় হিন্দু জগতের সৃষ্টিতে অনার্য্য কর্তৃক আহৃত উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিটেল (Kittel) সঙ্কলিত কানাড়ী ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কৃত-গত, অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত ও সম্ভাব্য, সার্দ্ধত্রি-শত দ্রাবিড় শব্দের আলোচনা আছে। ইহা হইতে আর্য্য বা হিন্দু সভ্যতায় দ্রাবিড় জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কোল-জগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা প্শিলুস্কি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—এই প্রবন্ধাবলী ফরাসী হইতে ইংরেজীতে অনুদিত হইয়া আমার সতীর্থ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কর্তৃক শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

এই সকল প্রাকৃত, আধুনিক আর্য্যভাষা ও সংস্কৃতগত দেশী ও অজ্ঞাতমূল শব্দ আলোচনার ফলে ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্তন সম্বন্ধে আমাদের বহুযত্নপোষিত অনেক ধারণা একেবারে উল্‌টাইয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, অনার্য্য-দত্ত উপাদান, হিন্দু সভ্যতার গঠনে অনার্য্যের সাহায্য, আর্য্যের আহৃত উপাদান এবং আর্য্যের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে, বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ গভীর, বিশেষ ভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষ ভাবে মূলস্থানীয়। এই বিষয়ের আলোচনা এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমাদের ভারতীয় সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে তাম্বূলের একটা বড় স্থান আছে। পান খাওয়া, পান দিয়া সংবর্দ্ধনা করা, পূজায় পান দেওয়া—এই সমস্ত বিশেষরূপে ভারতীয় রীতি। পান কিন্তু আদি যুগের আর্য্যাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বাস্তবিক, ভারত ও ভারতসম্পৃক্ত এশিয়াখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ এবং দ্বীপময় ভারত ভিন্ন অন্যত্র পান খাওয়ার রীতি নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের বস্তু—ভারত, ভারত-চীন (ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ), মালয় দেশ এবং দ্বীপময় ভারত। নবাগত আর্য্যদের কাছে এই রীতি নিশ্চয়ই নূতন ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কালে এই দেশের পুরাতন বা সনাতন রীতি হিসাবে ইহা নিজ স্থান ত্যাগ করিল না, আর্য্যদেরও সামাজিক ও অন্য অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। পানবাচক শব্দও আর্য্যরা নিজ ভাষায় না পাইয়া অনার্য্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্রবাচক একটী সাধারণ শব্দকে বিশেষণে ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে আর্য্য সংস্কৃতাদি ভাষায় অনার্য্য কোল জাতীয় 'তাম্বুল' শব্দের প্রবেশ ; এইরূপে সাধারণ পত্রবাচক 'পর্ণ> পণ্ন> পান' শব্দের তাম্বুল-পর্ণ অর্থে অর্থসঙ্কোচ। কোনও সংস্কৃত বা সংস্কৃত-জ ভাষায় প্রাপ্ত কোনও শব্দকে সংস্কৃতের ধাতু প্রত্যয়ের সাহায্যে

যদি নিশ্চিতরূপে যুক্তির অনুকূলভাবে বিশ্লেষ বা ব্যাখ্যা করিতে না পারা যায়, এবং সেইরূপ শব্দ যদি ভারতের বাহিরের ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষায় যদি না মেলে, তাহা হইলে ঐ শব্দের আর্য্যত্বের সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ থাকে। তাহার পর, শব্দটী যদি এমন বিষয় লইয়া হয়, যাহা ভারতের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ, এবং অনার্য্যভাষায় অনুরূপ শব্দ যদি থাকে ও অনার্য্যভাষার শব্দ-সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী সেই ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদের মত বক্ষ্যমান পদের বিশ্লেষ যদি হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শব্দ অনার্য্যভাষা হইতে গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি আইসে। 'তাম্বূল' শব্দ এই শ্রেণীর শব্দ। সংস্কৃতে ইহা অসংস্কৃত পদের ছাপ লইয়া আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও আর্য্যভাষায় এই শব্দ মিলে না। অপিচ তাম্বূলসেবা ভারতীয় রীতি স্বীকার করিতে হয়, এবং দেখা যায় যে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চীনে ও ইন্দো-নেসিয়ায় প্রচলিত কোলভাষা সম্পৃক্ত মোন্-খ্মের প্রভৃতি ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়যোগের রীতি অনুসারে 'তম্'-উপসর্গ যোগে পর্ণার্থক 'বল্' শব্দ মিলিত হইয়া প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল বা মোন্-খ্মের ভাষীদের মধ্যে "*তম্বল্" এইরূপ কোনও রূপ প্রচলিত ছিল (যাহার অনুরূপ শব্দ বহু জীবিত কোলসম্পৃক্ত মোন্-খ্মের ভাষায় মিলে), এবং আর্য্যভাষা সংস্কৃতে এই শব্দ 'তাম্বূল'রূপে গৃহীত হইয়াছে। উপসর্গবিহীন '*বল্' রূপও পর্ণার্থে ভারতে কচিৎ ব্যবহৃত হইত, এখনও কোথাও কোথাও ভারতের বাহিরে এই সব ভাষায় হয়। এখনও 'বল্' শব্দ পান অর্থে খাসিয়া ভাষায় মিলে। এবং তদ্ভিন্ন দুইটী বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে অনুপসর্গ 'বল্' শব্দ পাওয়া যায়—'বার্' ও 'বর্' রূপে—'বারুই' ও 'বরোজ' শব্দদ্বয়ে। 'বারুই' শব্দের প্রাচীন রূপ 'বারয়ী' খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতকের একখানি তাম্রশাসনে 'বারয়ী-পড়া' (বারুই পাড়া) রূপে লিখিত একটী গ্রামের নামে পাওয়া যায়। 'বারুই' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ করা হইয়াছে 'বারুজীবিন্'। 'বারু' কি? পান বলিয়াই অনুমিত হয়—মোন্-খ্মের ও তৎসম্পৃক্ত ভাষার পানবাচক 'বল্' শব্দের নজীরে। 'বারুই—বরোজ', এই দুইটী, অন্ততঃ আংশিক ভাবে বাঙ্গালার দুটী দেশী শব্দ, এ দেশে প্রচলিত অনার্য্যভাষা হইতে অধিগত। পুরাতন বাঙ্গালার 'তাঁবোল' আধুনিক বাঙ্গালার 'তাম্‌লী' শব্দও তদ্রূপ।

বাঙ্গালা ভাষার শত শত তদ্ভব ও দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য্য (মোন্-খ্মের কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, কৃষক ও অন্য নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সৃজ্যমান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য এই সকল শব্দের আশু সংগ্রহ করিয়া অভিধানজাত করিয়া ফেলা দরকার। পল্লীগ্রামে থাকিয়া

কাজ করিবার সুবিধা যাঁহাদের আছে, সেইরূপ মাতৃভাষানুরাগী স্বজাতিবৎসল সত্যানুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী যুবক অক্লেশেই স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সনের Bihar Peasant Lifeএর মত বইকে আদর্শ করিয়া এই শব্দ সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। এবং কেবল এই সংগ্রহ—জিজ্ঞাসা বা অভিনিবেশে শ্রবণ ও লিখনের দ্বারা তাঁহারা ভারতবিদ্যার ভাণ্ডারে এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়া যাইতে পারিবেন, যাহার মূল্য যাবৎ এই সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা থাকিবে, তাবৎ সুধীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায

কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয়

সকলেরই বোধ হয় জানা আছে, "বৌদ্ধগান ও দোহা"য় যে সকল গান ছাপা হইয়াছে, তাহা একজনের রচনা নয়। অনেকগুলি গীতিকারের নাম বৌদ্ধগানে পাওয়া যায়, যথা — লুইপা, সরহপা, নাগার্জ্জুনপা, শবরিপা, কৃষ্ণাচার্য্য, দারিকপা, ডোম্বী হেরুক ইত্যাদি। ইঁহাদের সময় নির্ণয় করিবার জন্য অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কতদূর ঠিক হইয়াছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, এ বিষয়ে যে সকল মালমশলা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহারই বলে আর একবার তাহাদের কালনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরই পাওয়া যায় না এবং এখনকার এই চেষ্টাই যে শেষ চেষ্টা, তাহাও বলিতে চাহি না। তবে যথাসম্ভব সত্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহা লোকবিশেষের উপকারে আসিতে পারে বিবেচনা করিয়াই এই বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যখন "বৌদ্ধগান ও দোহা" প্রথম বাহির হইল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষার একটা মস্ত উপকার হইল। কিন্তু ক্রমশঃ নানা উপসর্গ দেখা দিল। শেষ একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিলেন, ওটা বাঙ্গালাও না, হাজার বছরের পুরাণও না, গানও না, আর দোহাও না; বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা এই মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে মত সম্পূর্ণ ইতিহাসবিগর্হিত এবং ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রসাহিত্য আজ দশ বৎসরকাল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গুটিকতক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি এবং সেইগুলি "বৌদ্ধগান ও দোহা"র এবং গীতিকারদিগের কালনির্ণয়ে সহায়তা করিতে পারে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গান যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তান্ত্রিক ছিলেন এবং অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিলেন, কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য, কেহ কেহ বজ্রাচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইঁহারা অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং অনেকগুলির তর্জ্জমা আজিও তিব্বতীয় তেঙ্গুরে পাওয়া যায়। একদিকে গানগুলি ও অপর দিকে তাঁহাদের রচিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুস্তকগুলি মিলাইয়া দেখিলে নানারূপ নূতন খবর পাওয় যায় এবং নানা জটিল প্রশ্নের সমাধান করা যায়। সিদ্ধাচার্য্য ও বজ্রাচার্য্যদিগের সম্বন্ধে খুব কমই মালমশলা আছে, তাহার ভিতর নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তকই উল্লেখযোগ্য।

১। তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস।

২। শরচ্চন্দ্র দাসের সম্পাদিত "পাগ সম জন্ জ্যান্"।

৩। গ্রুণ্ড ওয়েডেল সাহেবের ৮৪ সিদ্ধের ইতিহাস।

৪। ওয়াডেল সাহেবের তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম।

সকল পুস্তকগুলিতেই আজগুবি ব্যাপার এত অধিক যে, সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্থান দিতে ভয় হয়। কিন্তু তান্ত্রিক ব্যাপারে ইহা ছাড়া উপস্থিত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

তারানাথের পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তন্ত্র অসঙ্গের সময় বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে এবং তাহা গুরুশিষ্যপরম্পরায় ৩০০ বৎসর চলিয়া আসিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সময়ে খ্যাতি লাভ করে এবং জনসমাজে প্রচারিত হয়। তারানাথ আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, সরহ বুদ্ধকপালতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, লুইপা যোগিনীসঞ্চর্য্যা নামক তন্ত্র প্রকাশ করেন এবং কমল ও পদ্মবজ্র হেবজ্র-তন্ত্র, কৃষ্ণাচার্য্য সম্পুটতিলক, ললিতবজ্র কৃষ্ণযমারিতন্ত্র, গম্ভীববজ্র বজ্রামৃত, কুকুরিপা মহামায়াতন্ত্র এবং পিটো(?) কালচক্র তন্ত্র প্রকাশ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল সিদ্ধাচার্য্যেরা এক একখানি তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের যদি কালনির্ণয় হয়, তাহা হইলে এই সকল তন্ত্রের যাঁহাবা নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই সেই সিদ্ধাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালের লোক হইবেন। এখন দেখা যাউক, সিদ্ধাচার্য্যের কাহারও কালনির্ণয় করিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না।

তেঙ্গুরের এক তালিকা কর্দ্দিয়ে সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রথম ভাগের ২১১ পাতাতে একটি গুরুশিষ্যপরম্পরা দেওয়া হইয়াছে। সেই পরম্পবা এইরূপ :—

১। পদ্মবজ্র
|
২। অনঙ্গবজ্র
|
৩। ইন্দ্রভূতি
|
৪। ভগবতী লক্ষ্মী
|
৫। লীলাবজ্র
|
৬। দাবিকপা
|
৭। সহজযোগিনী চিন্তা
|
৮। ডোম্বী হেরুক

ইঁহারা সকলেই তন্ত্রেব পুথি লিখিয়া গিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, নেপাল হইতে আনীত একখানি পুথিতে এই সকল গ্রন্থকারের পুথি পর পর পাওয়া যাইতেছে। পুথিখানির একখানি নকল বরোদার পুথিখানায় আছে, আব একখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আছে।

তারপর আর্থার এভেলনের তন্ত্রপুস্তকের গ্রন্থমালায় "চক্রসম্ভারতন্ত্র" নামক একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকখানি কাজী ডাওয়াসম্ ডুপ ছাপাইয়াছেন। ইহাব মুখপত্রখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং এই স্থানে তিনিও একটি গুরুপরম্পরা দিয়াছেন। এই তালিকাও এখানে তুলিয়া দিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বলা দরকার যে, এই তালিকাটিতে বোধ হয়, কোন কোন স্থলে নাম বাদ পড়িয়াছে। কেন, তাহা পরে বলা হইবে।

১। সরহ
|
২। নাগার্জ্জুন
|
৩। শবরিপা
|
৪। লুইপা
|
৫। বজ্রঘণ্টা
|
৬। কচ্ছপা
|
৭। জালন্ধরিপা
|
৮। কৃষ্ণাচার্য্য
|
৯। বিজয়পা

১০। তিলিপা
|
১১। নাবোপা

এই যে দুইটি তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে যে সকল গ্রন্থকারের নাম আছে, তাহার একটির সময় নির্ণয় হইলেই বাকী সকলগুলির সময় ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক, উক্ত তালিকার কয়জনের সময় নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা সম্ভবপর।

তেঙ্গুরের তালিকায় দেখি, কমলশীল নামক একজন পণ্ডিত সরহের ব্যাখ্যানুসারে 'ডাকিনী-বজ্রগুহ্যগীতিমর্ম্মোপদেশ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, কমলশীল সরহের পরবর্ত্তী কালের লোক। কমলশীল সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু জানা আছে। তিনি শান্তরক্ষিত নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন এবং শান্তরক্ষিতের রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক বৃহৎ তর্কশাস্ত্রের পুথির উপর প্রায় পনর হাজার শ্লোকের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ও তাহার টীকা সম্প্রতি গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছে। কমলশীল তিব্বতের রাজা খি-সন-ডিউ সান্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিব্বতদেশে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সরহপাদ অন্ততঃ এই সময়ের পূর্ব্বকার লোক।

বৌদ্ধগানের সংশোধক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, গানগুলি দশম শতকের লেখা। তাঁহার পর অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে গানগুলি দশম শতকের লেখা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই অনুমানের স্বপক্ষে নানারূপ ভাষাবিষয়ক যুক্তি দিয়াছেন। মোটের উপর গানগুলি দশম শতকের লেখা বলিয়া নির্ণয় করিবার কারণ একটি। সেটি এই—লুইপাদ ও দীপঙ্কর

শ্রীজ্ঞান, দুই জনকেই তেঙ্গুরের তালিকায় "লুইঅভিসময়বিভঙ্গ" নামক একখানি পুথির গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, লুই এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একই সময়ের লোক। ববং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, লুইপাদ "লুইঅভিসময়" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর তাহাব টীকা "বিভঙ্গ" লিখিয়াছিলেন এবং যেহেতু মূল ও টীকা এই পুস্তকে ছিল, তাই দুই জনকেই গ্রন্থকাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভাষাবিষয়ক যত প্রকার কাবণই থাকুক না কেন, ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বপক্ষে না থাকিলে গানগুলিকে দশম শতকের লেখা বলিয়া কিছুতেই ধবা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত দুইটি তালিকাব আরও দুই একজনকে আমরা চিনি। তাঁহাদের একজন ইন্দ্রভূতি। এই ইন্দ্রভূতি উড্ডিয়ানের বাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রেব নাম পদ্মসম্ভব। তাঁহার একজন ভগিনী ছিলেন এবং তিনি ভাইয়ের নিকট দীক্ষা লইয়া পবে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ভগিনীর নাম লক্ষ্মীঙ্কবা। পদ্মসম্ভব শান্তবক্ষিতের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শান্তরক্ষিতেব বাড়ী ছিল "জাহোরে"। এই জাহোব শব্দটী তিব্বতীয় নাম এবং ঢাকা জিলাব সাভারেব অপভ্রংশ। যাই হোক, এই সকল অবান্তব কথায় সময় নষ্ট না করিয়া ইন্দ্রভূতির সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। পদ্মসম্ভব তিব্বতীয় ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ইনি শান্তবক্ষিতেব সহিত তিব্বতে গিয়া সম্যে নামক স্থানে একটি বিহার তৈয়ারী কবেন। এইটিই সেখানকার প্রথম বড বিহাব এবং উহা খৃষ্টীয় ৭৪৭ অব্দে নির্ম্মিত হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, পদ্মসম্ভবেব পিতা ইন্দ্রভূতি অন্ততঃ তাঁহাব ছেলের চাইতে ৩০ বৎসবেব বড় হইবেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রভূতির সময় ৭১৭ খৃঃ অঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আবার দাবিকপাদ নামক একজন গীতিকাব একটি গানে লুইপাদকে নমস্কার করিতেছেন। তাহা হইলেই বুঝা যায়, লুইপাদ দারিকপাদের আগেকার লোক। লুইকে সে জন্য অবশ্য দারিকের গুরু বলা যায় না, কারণ, লুইপাদ আদিসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করা খুবই স্বাভাবিক। তার পব তারানাথের কথায় আমরা জানি, কমল ও পদ্মবজ্র দুইজনে হেবজ্রতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং জালন্ধরিপাদ প্রথমে উহার উপর পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অতএব পদ্মবজ্র ও কম্বল জালন্ধরিপাদের পূর্ব্বেকাব লোক বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ধরা যাক্, জালন্ধরিপাদ পদ্মবজ্রের এক পুরুষ নীচে।

যদি ইন্দ্রভূতির সময় ৭১৭ খৃষ্টাব্দ হয় এবং যদি প্রত্যেক গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ১২ বৎসর করিয়া ব্যবধান ধবা হয়, তাহা হইলে প্রথম তালিকার গ্রন্থকারদের সময় নিম্নলিখিতভাবে দাঁড়াইবে।

পদ্মবজ্র	৬৯৩ খৃষ্টাব্দ
অনঙ্গবজ্র	৭০৫ "
ইন্দ্রভূতি	৭১৭ "

লক্ষ্মীঙ্করা	৭২৯	খৃষ্টাব্দ
লীলাবজ্র	৭৪১	"
দারিকপা	৭৫৩	"
সহজযোগিনী চিন্তা	৭৬৫	"
ডোম্বী হেরুক	৭৭৭	"

তাহার পর যদি পদ্মবজ্র ও জালন্ধরির মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান ধরা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় তালিকার গ্রন্থকারদের সময় নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত হইবে। এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার যে, দ্বিতীয় তালিকাটি নিঃসংশয়রূপে সত্য বলিয়া আমি মনে করি না এবং উহাতে জায়গায় জায়গায় দুই চারিজনের নাম বাদ পড়িয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, তিলিপা ও নারোপা মহীপালের সমসাময়িক। মহীপালের রাজত্বকাল ৯৭৮ হইতে ১০৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

সরহ	৬৩৩	খৃষ্টাব্দ
নাগার্জ্জুন	৬৪৫	"
শবরিপা	৬৫৭	"
লুইপা	৬৬৯	"
বজ্রঘণ্টা	৬৮১	"
কচ্ছপা	৬৯৩	"
জালন্ধবিপা	৭০৫	"
কৃষ্ণাচার্য্য	৭১৭	"
গুহ্যপা	৭২৯	"
বিজয়পা	৭৪১	"

উপরে লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরহ, নাগার্জ্জুন, শবরিপা, লুইপা, বজ্রঘণ্টা, কচ্ছপা ও পদ্মবজ্র সপ্তম শতাব্দীর লোক। জালন্ধরি, কৃষ্ণাচার্য্য, গুহ্যপা, বিজয়পা, অনঙ্গবজ্র, ইন্দ্রভূতি, লক্ষ্মীঙ্করা, লীলাবজ্র, দারিকপা, সহজযোগিনী চিন্তা ও ডোম্বী হেরুক অষ্টম শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ভিতব অনেকেই গান ও দোহা রচনা করিয়াছিলেন এবং "বৌদ্ধ গান ও দোহা"র ভিতর তাহার কতক কতক রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই গানগুলি বেশীর ভাগ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, দশম শতাব্দীতে নহে। যে সকল পণ্ডিতেরা গানগুলিকে হাজার বৎসবের পুরাণ না বলিতে চান, তাঁহাদিগকে উহা ১৩০০ বৎসরের পুরাণ বলিতে হইবে। এইবার গানগুলির সময় নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বারান্তরে সেগুলি বাঙ্গালীর লেখা কি না, তাহার বিচার করিবার চেষ্টা কবিব।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

বার্ত্তা—প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান*

প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে অর্থ

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইকনমিক্‌স্ বলিয়া যে শাস্ত্র পরিচিত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিশেষ; কিন্তু প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে পার্থিব সম্পদের উল্লেখ বা আলোচনা নাই, এ কথা সত্য নহে। হেসিয়ড্ (খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দী) তাঁহাব "কাজ ও দিন"[১] নামক গ্রন্থে পার্থিব সম্পদ্ অর্জ্জনের বিষয়ে কার্য্যকারী পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

লাঙ্গল-নির্ম্মাণ; বীজ-বপন, বৃক্ষ-রোপণ, শস্য-কর্ত্তন ও শস্য-মাড়াই; দাসমজুরদের তত্ত্বাবধান; বস্ত্র বুনন; কুকুর, ঘোড়া, বলদ ইত্যাদি পালন; মেষের লোম পৃথক্‌করণ; কাষ্ঠ-কর্ত্তন, জল-বাণিজ্য।

হেসিয়ডের পরবর্ত্তী ইয়োরোপীয় লেখকেরা মুখ্যতঃ রাষ্ট্র-তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইলেও আর্থিক কথা লইয়া নাড়াচাড়া কবিয়াছেন।

প্লেটো—খৃঃ পূঃ ৪২৯ ?-৩৪৭

প্লেটোর রচিত "রিপাব্‌লিক," "আইন" ও "সোফিষ্ট" নামক গ্রন্থত্রয়ে এমন অনেক আর্থিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা বর্ত্তমান যুগেব সমালোচনার আলোকেও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। "ইরিক্সিয়াস্" নামে তাঁহার একখানা ধন সম্বন্ধে ছোট কথোপকথন-গ্রন্থও আছে। প্লেটোব মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি আর্থিক; শ্রমবিভাগ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানবিশেষ; কৃষি, গোপালন, কারুকার্য্য, ঘরে ঘরে দ্রব্য বিনিময়, বিদেশ-বাণিজ্য ও কারেন্সি বা সিক্কা অত্যাবশ্যক। তিনি সম্পত্তি বণ্টন, টাকা ধার দেওয়া, সুদ, বাকীজায় ও এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। সত্য বটে, প্লেটোর আর্থিক চিন্তাপ্রণালী সুসংবদ্ধ নহে, তাহাতে রাষ্ট্রীয়, নৈতিক ও আর্থিক মতামতের একত্র সমাবেশ আছে, তথাপি পরবর্ত্তী বহু লেখক তাঁহার নিকট হইতেই অনেক আর্থিক বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন[২]।

জেনোফন—খৃঃ পূঃ ৪৩০-৩৫৭

জেনোফনের "ইকোনোমিকুসে" (œconomicu,) কি করিয়া গৃহস্থালী করিতে হয়, তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি গৃহস্থালী বলিতে পরিবার ও আশ্রিতদের কথা বুঝিতেন; কারণ,

---

* ১৩৩৫।২০এ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। টি কুক্ এই কবিতাপুস্তক ৩ খণ্ডে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। জে কে ইনগ্রামের হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি (অর্থনীতির ইতিহাস), সংবর্দ্ধিত সং, ১৯১৩, পৃ ৯।

২। আর এইচ্ এল্ প্যালগ্রেভ্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ডিক্সনারি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমির (অর্থনীতির ——— ———ত 'প্লেটো' শব্দ এবং ইন্‌গ্রামের হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি, পৃঃ ১২ ও ১৩।

তাহাদের ভরণপোষণের জন্য সম্পত্তির দরকার হয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, মুদ্রার লক্ষণ ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার আর্থিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জেনোফন এথেন্সের রাজস্ব বিষয়ে আলোচনাকালে উন্নতিবিধানের জন্য কার্য্যকারী ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু জেনোফন নূতন কোন কথা বলিতে সমর্থ হন নাই।

এরিষ্টটল্—খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২

এরিষ্টটল্ সর্ব্বপ্রথম ধনালোচনাকে বিশেষ এক বিজ্ঞান বা আর্টের মর্য্যাদা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক চিন্তার সহিত না জড়াইয়া তিনি কোথাও আর্থিক তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ ক্রেমাতিস্তিকে (Chrematistike) = তেতিকে (Ktetike) অর্থাৎ সাধারণতঃ ধন-সংগ্রহ। কখন কখন তিনি ঐ শব্দ সঙ্কীর্ণতর অর্থে প্রয়োগ করিয়া বিনিময় ও মুদ্রার সাহায্যে যে ধন সংগ্রহ হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। ধনসংগ্রহ-বিদ্যাকে তিনি নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়াছেন :—

১। শীকার : (ক) বন্য পশু, (খ) যাহারা প্রকৃতি কর্ত্তৃক দাসরূপে গঠিত।

২। ক্রেমাতিস্তিকে, ধনবিজ্ঞান বা ধনশিল্প (আর্ট)।

(ক) স্বাভাবিক, ইহার মধ্যে আছে—

(১) গোপালন ইত্যাদি।

(২) কৃষি (ফলের চাষও ধরিতে হইবে)।

(৩) মৌমাছি পালন।

(৪) মৎস্যরক্ষা।

(৫) পক্ষী পালন।

(খ) মধ্যবর্ত্তী—

(১) কাঠ চেরা।

(২) খনির কাজ।

(গ) অস্বাভাবিক Metabletike (মেতাব্লেতিকে) = বিনিময়।

(১) বাণিজ্য (ব্যবসা ও খুচরা বিক্রয়) :

১ম, জাহাজ রাখা।

২য়, বাণিজ্য চালান।

৩য়, দোকান চালান।

(২) টাকা ধার দেওয়া।

(৩) ভাড়াতে শ্রম খাটা :

১ম, কুশল কারিগর।

২য়, অকুশল কারিগর।

মাতৃস্তন্য পান না করিলে শিশু বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ কতকগুলি দ্রব্য বা ধন সংগ্রহ দরকার, যাহা না হইলে গৃহস্থালীর কার্য্য নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে; এরিষ্টটল্ সেগুলিকেই 'স্বাভাবিক' আখ্যা দান করিয়াছেন। এই আদর্শ হইতে যে দ্রব্য যত দূরে অবস্থিত, তাহার স্বাভাবিকতা তত কমিয়া যায় অর্থাৎ তাহা মধ্যবর্ত্তী এবং অস্বাভাবিক ধন সংগ্রহে পরিণত হয়। গৃহস্থালী অথবা রাষ্ট্রের কাজে লাগাইবার উপায়সমূহকে এরিষ্টটল্ ধন আখ্যা দিয়াছেন। ধন সংগ্রহ করিতে হইবে বটে, কিন্তু অপরিমিত ভাবে নহে। কারণ, গার্হস্থ্য আর্থিক নীতির অর্থ-শুধু ধন সঞ্চয় করা নহে; কোষবৃদ্ধি ও রাজ্যশ্রী রক্ষাও এক কথা নয়। এরিষ্টটল্ এইরূপে অর্থ-শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন, কিন্তু ঐকোনোমিকে (Oikonomike) 'গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান' অর্থেই ব্যবহৃত হইতে থাকে, আধুনিক অর্থশাস্ত্রের কথা বুঝাইবার জন্য ক্রেমাতিস্তিকে (তেতিকে) প্রচলিত ছিল। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পণ্ডিত তাঁহার "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিশাস্ত্র" নামক গ্রন্থে প্রথম "পলিটিকাল ইকনমি" বা "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" শব্দের প্রচলন করেন।

প্রাচ্যে অর্থশাস্ত্রের ধারা

ক্যালডিয়ানরা কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিল। অল্প আয়াসে তাহারা জমি হইতে অনেক ফসল উৎপাদন করিতে পারিত। তাহাদের প্রণালীসমূহ প্রথমে গ্রীকদের দ্বারা, পরে আরবদের দ্বারা অনুসৃত হইতে থাকে। ক্যালডিয়ান্ সভ্যতার তিরোধানের পরও এই প্রণালীসমূহ বর্ত্তমান ছিল, আব্বাসাইড্ খলিফাদের অধীনে থাকা কালে ইরাকীরা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল, ইবুন্ ওয়াহশিয়া প্রণীত "নাবাটিয়ান্ কৃষি" নামক গ্রন্থে (প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত আরবদের নাবাটিয়ান্ বলে) তাহার বিবরণী আছে। রেনাঁ বলেন, "এমন হইতে পারে যে, এই প্রণালীগুলি প্রাচীন এসিরিয়ার রীতিনীতির জ্ঞাপক, যেমন 'অ্যাগ্রিমেনসোরেস্ ল্যাটিনে' গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে সম্পাদিত পুস্তক হইলেও ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যায়"। প্রত্যেক সহরের কোন কোন মন্দিরের গ্রন্থাগারে মৃত্তিকাফলক-লিখিত কৃষিগ্রন্থ রক্ষিত হইত।

ডাক্তার চেন্ হুয়ান্ চাঙ্ প্রণীত "কন্‌ফিউশিয়াস্ ও তাঁহার স্কুল" নামক গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কন্‌ফিউশিয়াস্ (খৃঃ পূঃ ৫৫২-৪৭৯) ও তাঁহার শিষ্যগণের লেখায় ধনব্যবস্থা ও ধনবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্কনির্ণয়, ধন উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহার লইয়া আলোচনা ও রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়-ব্যবস্থার কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

ভারতে মহাকাব্যের যুগে বার্ত্তার উৎপত্তি

ভারতবর্ষে ধন সম্বন্ধে আলোচনা 'বার্ত্তা' নামে এক বিশেষ বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ তম অধ্যায়, ৬৮তম শ্লোকে বিদ্যাকে তিন ভাগে

বিভক্ত করিয়া, এক ভাগকে বার্ত্তা আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুরাণসমূহেও ত্রেতাযুগে বার্ত্তা বলিতে কি বুঝাইত, তাহার উল্লেখ আছে :—বায়ুপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৮, শ্লোক ১৩৪ ; মৎস্যপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১৪০, শ্লোক ১৩ ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ১০৭ ; পরিচ্ছেদ ৮, শ্লোক ১৯৫ ও পরিচ্ছেদ ৬৫, শ্লোক ৪।

কৌটিল্যমতে বার্ত্তা ও অর্থশাস্ত্রের

কৌটিল্যের মতে বার্ত্তা = অর্থানর্থৌ অর্থাৎ ধন ও ধননাশ ; আর অর্থশাস্ত্রের সীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে :—"অর্থ (ধন অথবা দ্রব্যাদি) মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ; মনুষ্যাবাসভূমিকে (বা দেশকে) অর্থ কহে , যে বিজ্ঞান ভূমি বা দেশ লাভ করিবার, রক্ষা করিবার ও তাহার উন্নতি করিবার বিষয় আলোচনা করে, তাহা অর্থশাস্ত্র।" বুঝা যাইতেছে, অর্থশাস্ত্র ধনালোচনা হইলেও দণ্ডনীতি বা রাজ্যশাসন লইয়া আলোচনা করিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ বার্ত্তা কেবল ধনালোচনায় সীমাবদ্ধ, আর অর্থশাস্ত্রের সহিত বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিচার-কার্য্য, যুদ্ধবিদ্যা, রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্পর্কনির্ণয় ও রক্ষা, নগরগঠন ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত।

কৌটিল্যের মতে (১) পুরাণ, (২) ইতিবৃত্ত, (৩) আখ্যায়িকা, (৪) উদাহরণ, (৫) ধর্ম্মশাস্ত্র এবং (৬) উল্লিখিত বার্ত্তা-সংবলিত অর্থশাস্ত্র ইতিহাস-বেদের অন্তর্গত। অথর্ব্ববেদ (১৫, ৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩, ১২, ৮, ২), শতপথ ব্রাহ্মণ (১১, ৫, ৬, ৪—৮ ; ১৩, ৪, ৩, ৩ ; ১৪, ৫, ৪, ১০, ৬, ১০ ; ৬ ; ৭, ৩, ১১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২, ৯, ১০), শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র (১৬, ২, ২), আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১০, ৭, ১), শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র (১, ২৪, ৮), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (৩, ৩, ১—৩), হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র (২, ১৯, ৬), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (২, ৪, ১০, ৪, ১, ২), মৈত্রায়ণ উপনিষদ্ (৬, ৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থেও ইতিহাসের উল্লেখ বা আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রসমূহে পুরাণ ও ইতিহাস একত্র উল্লিখিত আছে। অতএব 'বৈদিক' ইতিহাস ও কৌটিলীয় 'ইতিহাস' এক বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক যুগেব পরবর্ত্তী সংস্কৃত, পালি অথবা জৈন সাহিত্যেও ইতিহাস শব্দ কৌটিলীয় অর্থে ব্যবহাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র অথবা ইতিহাসের যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ কবিয়াছেন, তাহা হইতে বার্ত্তাব কাল সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৃত্তি, ব্যবসা ও বার্ত্তা

বার্ত্তা বিদ্যার একটা শাখারূপে পরিগণিত ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যদের বৃত্তিকে বুঝাইবার জন্যও ব্যবহৃত হইত[১]। বলা বাহুল্য যে, বৃত্তি অর্থাৎ বৈশ্যদের জীবিকা অর্জ্জনেব উপায়কে বিদ্যারূপে উন্নীত করিবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম ও

১। কৌটিল্যমতে বার্ত্তা শূদ্রদেরও জীবিকা অর্জ্জনের উপায় ছিল।

জীবন-ধারণোপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৈশ্যগণের অনুসৃত জীবিকোপায় বুঝাইবার জন্য বার্ত্তার প্রচলন রামায়ণ ও তৎপরবর্ত্তী সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহে ভূরি ভূরি দেখা যায়[১]।

বার্ত্তার প্রধান অঙ্গ হইতেছে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। ইহা ধান্য, পশু, হিরণ্য, বন জাত দ্রব্য, শ্রমিক ইত্যাদি প্রদান করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা (কৌটিল্য, ১ম ভাগ, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃষ্ঠা ৮)। অন্য কেহ কেহ টাকা ধার দেওয়াকেও ইহার অন্তর্গত বিবেচনা করিয়াছেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ৫, শ্লোক ৭৯,—নীলকণ্ঠের টীকা ; ভাগবতপুরাণ, স্কন্ধ ১০, পরিচ্ছেদ ২৪, শ্লোক ২১—

কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥

তৃতীয় বর্ণের জীবিকার উপায় ছিল বার্ত্তা। কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য ও কুসীদকে মনু বার্ত্তারূপে গণনা করিয়াছেন। পরন্তু বৈশ্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন,—"বৈশ্যকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, ধাতু, সূতার কাপড়, আতর ও পোষাকের দাম জানিতে হইবে। বীজ কেমন করিয়া বপন করিতে হয়, কোন্ ক্ষেত ভাল আর কোন্টা মন্দ, দাঁড়িপাল্লার সঠিক ওজন ইত্যাদির খবর তাহাকে রাখিতে হইবে। দ্রব্যাদির গুণাগুণ, বিভিন্ন দেশের দোষগুণ, পণ্য বিক্রয়ে লাভ ক্ষতি, গোপালনের উপায়, ভৃত্যদের বেতন, বিভিন্ন দেশের ভাষা, জিনিষ রক্ষা করিবার প্রথা ও ক্রয় বিক্রয়ের নিয়মাবলী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান থাকা চাই।" বলা বাহুল্য, মনুর এই বিস্তৃত তালিকা পূর্ব্বোক্ত ৩৪ দফার মধ্যেই পড়িয়া যায়। প্রত্যেক বৈশ্যই ঐগুলি করিত, এমন নয়, বৈশ্যদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল (মনু, ৪, ৩২৯-৩৩২)। কৌটিল্য ও মনুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, (১) কৌটিল্য কুসীদের উল্লেখ করেন নাই ; (২) মনু বলেন, শূদ্রের কর্ত্তব্য হইতেছে—উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা। কৌটিল্য তাহার সহিত বার্ত্তা ও কারু কুশীলবকর্ম্ম (বা শিল্পী ও গায়কের বৃত্তি) যোগ করিয়া দিয়াছেন। কারু-কুশীলবের নাম আলাদা করায় বুঝা যাইতেছে যে, গোড়ায় ইহা বার্ত্তার অন্তর্গত ছিল না। বিষ্ণু পুরাণেও (১৷৬৷২০৷২) "বার্ত্তোপায়" ও "কর্ম্মজা হস্তসিদ্ধি" এই উভয়ের ভিতর ভেদরেখা টানা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রামায়ণের সময় হইতেই বার্ত্তাকে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও দণ্ডনীতি—এই তিন বিদ্যাবিভাগের তুল্য সম্মান প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং সে সময়ে এ বিদ্যা যে

১। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, শ্লোক ৪৭ ; মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ৬৮, শ্লোক ৩৫ ; সভা প, পরি ৫ শ্লোক ৭৯ ; ভগবদ্গীতা ১৮, ৪৪ ; কৌটিল্য, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃঃ ৮ ; বায়ুপু, পরি ৮, শ্লোক ১২১, ১৩০, ১৩৬, পরি ২৫, শ্লোক ১০৩ ; বিষ্ণুপু, পরি ৬, শ্লোক ২০, ৩২ ; ভাগ পু, স্ক ৭, পরি ১১, শ্লোক ১৫ ; স্ক ১০, পরি ২৪, শ্লোক ২০, ২১ ; স্ক ১১, পরি ২৯, শ্লোক ৬৩ ; ব্রহ্মাণ্ডপু, পরি ৮, শ্লোক ১৩৩ ; পরি ২৩, শ্লোক ১৪ ; লিঙ্গপু, পরি ৩৯, শ্লোক ৪০ ; পরি ২৯, শ্লোক ১৬ ; ভবিষ্যপু, ব্রাহ্ম পর্ব্ব, পরি ৪৪, শ্লোক ১০ ; নারদীয় পু, অত্রিসংহিতা, শ্লোক ১৪, ১৫।

প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তৃতীয় বর্ণকে কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য ও কুসীদের ভার অর্পণ করিবার পর এই সাহিত্যের অধিকতর বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাকে বিদ্যারূপে গণনা করার পর হইতে কৃষি ইত্যাদি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় ও সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইতে থাকে। রাম ভরতকে (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০০, শ্লোক ৬৮, ৪৭) ও যুধিষ্ঠির নারদকে (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, পরি ৫, শ্লোক ৭৬ - ৭৯) কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত লোক ও বার্ত্তার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

বার্ত্তার উল্লেখ ও সীমা

বার্ত্তা বলিতে যে চারিটি বিষয় বুঝাইত, তাহা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বার্ত্তা ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইত[১]। যথা দেবীপুরাণে, পরিচ্ছেদ ৩৭, শ্লোক ৬১—

পশ্বাদিপালনাদ্দেবি কৃষিকর্ম্মান্তকারণাৎ।
বর্ত্তনাদ্ বারণাদ্ বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে॥

বস্তুতঃ বার্ত্তা ধন সম্বন্ধে আলোচনার একটা শাখা-বিদ্যা ছিল না, ইহা ধনবিষয়ক পরাবিদ্যা ছিল। মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার 'প্রস্থানভেদে' বিদ্যার ১৮টি ভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—৪ বেদ +৬ অঙ্গ+৪ উপাঙ্গ+৪ উপ-বেদ (আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ ও অর্থ-শাস্ত্র)। কোন কোন ক্ষেত্রে উপবেদ না ধরায় ১৪ বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। যে চারিটী বিদ্যাকে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে বার্ত্তা একটি। দেখা যাইতেছে যে, মধুসূদনের মতে 'অর্থশাস্ত্র' উপবেদ। ইহাতে আলোচিত হয় নীতিশাস্ত্র (রাষ্ট্রীয় দর্শন বা নীতি), অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র (কারুকার্য্য ও কলা), সূপকারশাস্ত্র (রন্ধনবিদ্যা), চতুঃষষ্টি কলাশাস্ত্র। অর্থ অর্জ্জন সম্পর্কে বার্ত্তা সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা। অর্থশাস্ত্র ব্যাপকতর হইলেও উহার যে যে অংশে অর্থের আলোচনা আছে, সেই সেই অংশ বার্ত্তার অন্তর্গত।

১। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বার্ত্তার নাম করা হইয়াছে, তাহার কতকগুলির নাম দেওয়া যাইতেছে,—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০০, শ্লোক ৬৮ (পরোক্ষ); মহাভারত, বনপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ১৫০, শ্লোক ৩০, ৩১; শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ১৮, শ্লোক ৩৩ ও পরিচ্ছেদ ৫৯, শ্লোক ৩৩; হরিবংশ, পরিচ্ছেদ ৪০, শ্লোক ৩৯ (পরোক্ষ), মনু, ৭, ৪৩; যাজ্ঞবল্ক্য, ১, ৩১১; কৌটিল্য, প্রথম ভাগ, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃষ্ঠা ৬, ৭, অগ্নিপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২২৫, শ্লোক ২১, ২২ (মনু দ্রষ্টব্য); পরিচ্ছেদ ২৩৭, শ্লোক ৩, পরিচ্ছেদ ২৩৮, শ্লোক ৯ (কৌটিল্য, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭, লাইন ১ ও ২), বায়ুপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৬১, শ্লোক ১৯৭; মৎস্যপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২১৫, শ্লোক ৫৩ (মনু দ্রষ্টব্য), পরিচ্ছেদ ১৪৫, শ্লোক ৩৬, ভাগবতপুরাণ, স্কন্ধ ৩, পরিচ্ছেদ ১২, শ্লোক ৪৪, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগ ১, পরিচ্ছেদ ৯, শ্লোক ১, ৯, ভাগ ২; ৪ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৮৪; ভাগ ৫, পরিচ্ছেদ ১০, শ্লোক ২৩—৩০; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ১০৭; পরিচ্ছেদ ৬৪, শ্লোক ২৫, ৩২; পরিচ্ছেদ ৬৫, শ্লোক ৩৯, ব্রহ্মপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২০, শ্লোক ৮৫, পরিচ্ছেদ ১৭৯, শ্লোক ৪০; পরিচ্ছেদ ১৮৭, শ্লোক ৪৩—৪৬, দেবীপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৩৭, শ্লোক ৬০, ৬১; শিবপুরাণ (বায়বীয় সংহিতা), ভাগ ১, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ২২।

বার্ত্তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন

রাষ্ট্রে যাহাতে বার্ত্তার নিয়মাবলী যোগ্য লোকদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, সে জন্য রাজা সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। এই জন্য রাজাকে বার্ত্তার বিশেষভাবে দরকারী বিষয়গুলি, যেমন কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য আয়ত্ত করিতে হইত ও সে জন্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্রয়োজন হইত। মনু রাজার বিষয়ে বলেন (৭,৪৩),—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥

কৌটিল্য রাজপুত্রদের পাঠোপযোগী বিষয়ের মধ্যে বার্ত্তার নাম করিয়াছেন, রাজকীয় কার্য্য-বিভাগের অধ্যক্ষগণ—যাঁহাদের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল ও যাঁহারা কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্মের ভার লইতেন, তাঁহারা এই সব বিষয় রাজপুত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন।

বার্ত্তা কাহারা পড়িত ?

ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অথবা ছাত্রদের শিখাইবার জন্য বার্ত্তা অধ্যয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা শুধু যে দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিখাইতেন, তাহা নহে, তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা, শস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল ও অন্যান্য কার্য্যকরী বিদ্যা শিখাইতে সমর্থ ছিলেন। রাম শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলেন বিশ্বামিত্রের নিকট, আর পাণ্ডবদের যুদ্ধবিদ্যার গুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য্য। শান্দীপনি কৃষ্ণকে বিদ্যার নানা শাখা ও ৬৪ কলা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বার্ত্তা মুখ্যতঃ বৈশ্যদের অবলম্বনীয় ছিল, আর দণ্ডনীতি ক্ষত্রিয়দের। চতুর্থ বর্ণ বা শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার ছিল না। কৌটিল্য বলেন, দ্বিজসেবা ছাড়াও তাহারা বার্ত্তার অন্তর্গত কোন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।

গ্রীস্ অথবা ভারতের আর্থিক গ্রন্থসমূহ আজিকার গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না। বার্ত্তার কার্য্যকারী উদ্দেশ্য ছিল—চাষী, রাখাল, স্বর্ণকার কলাবিৎ শিল্পী ও ব্যবসাপরিচালক প্রভৃতিকে চালিত করা। কিন্তু অদ্যাবধি 'বার্ত্তাশাস্ত্র' এই নামযুক্ত কোন পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কারণ, আন্বীক্ষিকী কিম্বা ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত পুস্তকাবলীর কোনটাকেই আন্বীক্ষিকী বা ত্রয়ী নামে পরিচিত হইতে দেখি না। মোটামুটি বার্ত্তার কতকগুলি আলোচ্য বিষয় হইতেছে,—স্থাপত্যবিদ্যা, গৃহনির্ম্মাণ, চিত্রাঙ্কণ, মূল্যবান্ রত্নপরীক্ষা, কৃষি, বৃক্ষপালন, বৃক্ষরোপণ, বাটিকা-নির্ম্মাণ, গো-রক্ষা, হস্তশিল্প, গাড়ী-জাহাজ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি। বার্ত্তাবিষয়ক পুস্তকাদিতে আধুনিক অবরোহ ও আরোহ-প্রণালীতে আর্থিক মূলসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায় না।

উপসংহার

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে ধনালোচনা বিশেষ এক বিদ্যারূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। ইহার প্রথম উৎপত্তি হয় রামায়ণের কালে, বৈশ্যবর্ণের বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইবার পর এই বিদ্যার সমুদ্ভব হয়। অর্থ সম্বন্ধে চিন্তাবলীর নিদর্শন গ্রীকসাহিত্যের এখানে সেখানে

পাওয়া গেলেও, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এরিষ্টট্‌ল্ ইহাকে প্রথম ধনবিজ্ঞানরূপে বিশেষত্ব প্রদান করেন। ভারতে বিশিষ্ট বিদ্যারূপে বার্ত্তার উৎপত্তি সম্ভবতঃ এরিষ্টট্‌লের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ক্যাল্‌ডিয়ান্‌রা কৃষিতে সবিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল ও তাহাদের প্রণালী গ্রীকরা ও আরবেরা গ্রহণ করে; তাহারা তাহাদের গ্রন্থাগারসমূহে কৃষি বিষয়ে যে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গ্রন্থ রাখিয়াছিল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, একমাত্র "নাবাটিয়ান্ কৃষি' নামক যে গ্রন্থের সন্ধান পাই; তাহা হইতে কৃষি-প্রণালীর কথা জানা যায়। কিন্তু ক্যালডিয়ান্‌রা অর্থ সম্বন্ধে যে ভিন্ন একটি বিদ্যার চর্চ্চা করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ডাক্তার চেন-হুয়ান্-চাঙের গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, চীনে কনফিউশিয়াস্ ও তাঁহার শিষ্যগণের লেখায় অনেক আর্থিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি এ কথা বলেন নাই যে, কন্‌ফিউশিয়ান্ জীবনের আর্থিক উন্নতিকে ভিত্তি করিয়া বিশেষ এক বিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতে এই বিদ্যা প্রাচীন কাল হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল ও তদ্দ্বারা জনসাধারণের আর্থিক কার্য্যাবলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ গতি প্রদান করিবার চেষ্টা করা হয়। গোড়ায় বৈশ্যবৃত্তিরূপে পরিচিত হইয়া ইহার অন্তর্গত বিষয়গুলি তিনটিতে দাঁড়াইয়াছিল—কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য। এই বিদ্যার উল্লেখ যে শুধু সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা যায়, তাহা নয়; বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতেও পাওয়া যায়। কল্পসূত্রে দেখিতে পাইবে ঋষভ তাঁহার রাজত্ব-কালে লোকের উপকারের নিমিত্ত ৭২ বিজ্ঞান...... স্ত্রীলোকের ৬৪ বিদ্যা, ১০০ কলা ও পুরুষের ৩টি বৃত্তি শিখাইতেন। অধ্যাপক যাকবি এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, —"কুমোর, কামার, পটুয়া, তাঁতি ও নাপিত, এই পাঁচজনের ব্যবসার প্রত্যেকটীর ২০টী করিয়া শাখা আছে—এই ব্যবসাগুলি শিখিতেই হইবে। আর কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি বৃত্তি আপনা আপনিই বিকাশ লাভ করিয়াছে।" কিন্তু তিনি পুরুষের ৩ বৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই, উহা কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য বুঝাইতেছে। মিলিন্দপঞ্হে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, কষি, বণিজ্জা, গোরক্‌খা শিখান হইত অর্থাৎ তখন বিদ্যারূপে বার্ত্তার বিকাশের প্রথম যুগ চলিতেছিল।

এই বিদ্যা ক্রমে ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া ধন সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞান বুঝাইত ও পূর্ব্বে মনুষ্যজ্ঞানের যে ৩ বিভাগ ছিল (আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও দণ্ডনীতি), তাহাদের সমতুল্যরূপে গণিত হইয়াছিল। এক দিক্ হইতে দেখিলে এই চারিটি বিদ্যা মানবের সমুদয় জ্ঞানসমষ্টি ও মূল্য হিসাবে বার্ত্তা অপর তিনটির সমান। কিন্তু অন্য দিকে কৌটিল্য বলিতেছেন, সকল রকম বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে যেরূপ অবস্থা দরকার, তাহা যদ্দ্বারা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ দণ্ডনীতি হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কারণ, ইহা রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে বলিয়াই লোকেরা অন্যান্য বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়।

বার্ত্তা যে একটা ভিন্ন বিদ্যা ছিল ও বিদ্যায়তনে অধ্যাপক কর্ত্তৃক ইহার পঠন-পাঠন হইত, তাহার প্রমাণস্বরূপ এক শিলালিপি দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গিয়াছে[১]। তাহাতে জানা যায় যে,

---

১। তলবাগুণ্ডির শিলাশাসন, ১০৩ নং (এল্ রাইসের মহীশূর-শিলালিপি, পৃঃ ১০১)

স্থানগুণ্ডুরু অগ্রহারে "ভেষজ, ইন্দ্রজাল, তর্কবিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা, কাব্য, শস্ত্রবিদ্যা, যজ্ঞ··· বন্ধনবিদ্যায় সুদক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী বিরাজ করিতেন। এই স্থানের কুঞ্জসমূহ নন্দনকাননকেও পরাজিত করিত, আর অগ্রহারের এরূপ গৌরব ছিল যে, চতুষ্পার্শ্বের সকল দেশ চারি বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসার ৩ পক্ষ, তর্ক ও তদ্রূপ শাস্ত্রসমূহ, ১৮ মহাপুরাণ, কতিপয় স্তুতিরচনা, বাস্তু-নির্ম্মাণরীতি, গীত ও নৃত্য ও স্থানগুণ্ডুরু অগ্রহারের ব্রাহ্মণগণের পরিজ্ঞাত বিদ্যাচতুষ্টয় শিখিবার জন্য লালায়িত হইত।" চারি বিদ্যার মধ্যে একটি বার্ত্তা—বার্ত্তার অন্তর্গত কোন কোন বিষয় শিলালিপিতে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শিলালিপি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর। সুতরাং বিদ্যারূপে বার্ত্তার চর্চ্চা তখনও ভারতে অপ্রচলিত বা লুপ্ত হইয়া পড়ে নাই, বুঝিতে হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গ্রাম্য সঙ্গীত

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে জয়কাব জনৈক জমিদাব মহোদয়েব সাহায্যে কিশোবগঞ্জে সংগৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কার্ত্তিকপূজা উপলক্ষ্যে গীত—ইহা গৃহস্থ অন্তঃপুববাসিনীগণ কর্ত্তৃক গীত হইত :—

(১) বুলেবে কার্ত্তিক জাইবান্ শশুববাড়ী
আলুয়া চাউলে খেঁসাবিব ডাইলে সঞ্জম বালা
কিশোরগঞ্জেব বাজাবেব কাচা মবচে মুলাই বাইংগনে সঞ্জম বালা
বুলেরে এক পুতেব মা ঐইয়া গো দুইয় পুতেব মা ঐইব
বুলেরে ম্যাংবাজেব বাজ্য আমাব শামের ঐক
বুলেবে আমাব শামেব হাতে ওক সোনাব খড়ি
বুলেবে ছায়লান্‌বে ছায়লান্‌বে কার্ত্তিক যাইবাইন্ শশুববাড়ী
আলুয়া চাউলে—ইত্যাদি।

(খ) প্রাদেশিক ও সামাজিক প্রথা অনুসাবে বিবাহেব কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যাকালে একত্রিত হইয়া বাদ্যযন্ত্রেব সাহায্য ব্যতিবেকে সমস্ববে নিম্নলিখিতরূপ গান অন্তঃপুববাসিনীগণ গাইয়া থাকিতেন :—

(১) তুমি গেলে বন্ধু তুমি গেলে দ্বাব ছাইবা তো দিব না
গুমাইয়াছে গো আমার রাই কাচা সোনা।
বন্ধুবে এ সিদুবেব বিন্দু বিন্দু অঙ্গে দেখা যাহা কঙ্কনেব ছিলবে বন্ধু
কে দিল তোর গায়, মুই অবাগিবে বন্ধু মুই অবাগি।
যুগল মিলন ওইল না, গুমাইয়াছ গো আমার বাই কাচা সোনা॥
বন্ধুরে বাকিয়া গুপালে বহু কথা মিথ্যা নহে
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেবে বন্ধু গিয়াছে নিবচ॥
তুমি গেলেরে বন্ধু তুমি গেলে যুগল মিলন হইল গুমাইয়া॥

(২) যার লাগ গো যার চিন্তে গো দয়ে ও প্রেম বিচ্ছেদের
উজা বুজি নাইগো সংসারে যে বিষে দইছে অঙ্গ আমার
নাই মর বাচিতে কি করি বল না সই গো দয্য ধরিতে।
বল পুবা যাহে সবে গো দেখে আমার মনের অনল জলচে দ্বিগুণ
কেউতো না দেখে, বল অনল জল দিলে নিবে।
মন অনল নিবে কিসে॥

সর্পের বিষ বদে গো জারে প্রেম বিচ্ছেদের উজা বুজি
নাই গো সংসারে, যে বিষে দয়েছে অঙ্গ, আমার নাই মোর বাচিতে ॥
কৃষ্ণমণি বলে দনি শ্যাম ভান্দা তোর পিরীতে কি করি
বল না সই গো দয্য ধরিতে ॥

(৩) এ কি শুনা যা হে সুধা পাছে বাশি
বাজাও শ্যাম রা হে জাগ বিসকা জানে আহ ॥
বাশির শব্দ শুনি গৃহে তাকা ঐল দায়
আসে কি না আসে বন্ধু আসে কি না আসে বন্ধু
বল ভুছি কি উপায় হে ॥
কদম্ব ডালেতে বসি শ্যামে রাজা হে গো বাসি
বাশিব সুবে বাধা বলে গৃহে তাকা ঐল দা হে
জাগ বিসকা জাইলে হায় ॥
বিসকাব হাতে ধবি বৃন্দে কহে গো
বিসকে শ্রীগুরু কাঙ্গাল হইলে টেক্‌লাম রাধার প্রেম দায় ॥

বিবাহের বস্থাজের (বাসবের) গান।

ছাইরা দেগো চন্দ্রাবলী আমাব অতি সাদেব বংশীদাবী গো ও ছাইবা দে
করিয়া পুষ্পেব শয্যা আমি সগল রাত্র বইসা তাকি গো ও ছাইরা দে
ছাইবা দে গো বাইকিশোবী আমাব একা কুঞ্জে রৈল পীয়ারি গো ও ছাইরা দে ॥
বানাইয়া পানেব বিবি আমি দতে সতে মাতাব কিবা গো ও ছাইরা দে
জালাইয়া মুমেব বাতি আমি সগল বাত্র বইলাম বসি গো ও ছাইবা দে ॥
জল বরিতে হইলাম সারি সারি বাই জলের বাকার কৈবে যাই—গো ধনের
পঞ্চ গটী অম্রপত্র দিয়া তাতে জল বরিতে হইলাম সারি সাবি
রাই জলেব বাকার কৈরে যাই।
কলসি লইয়া কাকে শ্রীরাধিকার হরি বলে কলসি বাসাইয়া
নীল জলে রাই জলের বাকাব কৈরে যাই ॥
নিকুঞ্জমন্দিরে বসি মালা গাতে বাই রূপসী—
দিতাম মালা কালাচাঁদের গলে রাই ॥
মালা দেখে ননদী কহে এ মালাতো দাদার নহে—
দেখেছি মালা কালাচাঁদের গলে রাই জলের বাকার কৈরে যাই ॥

তাৎকালিক প্রাদেশিক ভাষা ও শব্দ সম্বন্ধে উদ্ধৃত গীতগুলি হইতে কতক কতক আভাস

পাওয়া যায়। শেষ গানটী আধুনিক বলিয়া প্রকাশ পায়, অপরগুলি পুরাতন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রচলিত যে ভাষায় স্থানীয় লোকে সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকিতেন, তাহা অন্যরূপ, কেবল কতকগুলি শব্দের ঐক্য আছে। এক্ষণে কথিত ভাষা লিখিত ভাষার কতক কতক অনুরূপ হইয়া আসিতেছে। সুব ব্যক্ত করা কঠিন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ

তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব

রসকদম্বের অন্যতম সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ-লিখিত 'তরুণীরমণের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে (সা° প° প°, ২৬শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা) সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় হইতে কবির ৭টি এবং অপর একখানি পদসংগ্রহের পুথি হইতে ১০টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষে আলোচনার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্দেহ হইয়াছে যে, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং তরুণীরমণ। বিগত ১৩১২ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শিষ্য মুকুন্দদাস গোস্বামি-প্রণীত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সম্পাদকতায় কাশীমবাজারের মহারাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। উহাতে তরুণীরমণের সর্ব্বসমেত ৪৫টি পদ আছে। প্রবন্ধোদ্ধৃত 'অম্বর হেরি হবল ধনী সম্বিত' ইত্যাদি পদ সাতটি মুদ্রিত পুস্তকের পর পর ১২৮—১৩৩ পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। পদসংগ্রহের উদ্ধৃত দশটি পদের মধ্যে 'বেদ বেদান্তর বিচার করিয়া জাহারে করয়ে হীন', 'রসের সায়রে পীরিতি মগর প্রেম তরঙ্গআরধারী', 'তিনটী আখরে না জানি কি আছে তিনের করিলে বশ', 'তিনের মরম জেবা নাহি জানে তিনে কিবা তার কাজ' এবং 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে' পাঁচটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ২৮৬৫ সংখ্যক তরুণীরমণের পদাবলীর (* * রসামৃত পদাবলী) খণ্ডিত পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের পরিষৎ সংস্করণে 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর' এবং 'তিনটী আখরে না জানি কি আছে' পদ দুইটি চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তরুণীরমণের কত পদ অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে কে জানে? সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে ধৃত তরণীরমণের (তরুণীরমণ ?) সাতটি পদই মুদ্রিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের যথাক্রমে ১৩০, ১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ ও ১৫৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক রত্নসার পুথি হইতে 'ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন॥' পঙ্ক্তিদ্বয় এবং পরবর্ত্তী 'পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর' ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় তরুণীরমণ চণ্ডীদাস আর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন (মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৪)। সে কথা পরে হইবে। আমরা শুনিয়াছি, বীরভূম বিবরণের সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তরুণীরমণের বহু পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালাতেও তরুণীরমণের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরাও তরুণীরমণের বিস্তর পদের সন্ধান পাইয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে, তরুণীরমণ যথেষ্টসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং পদগুলি উচ্চভাবপূর্ণ। অতঃপর আমরা অঙ্গহানি না করিয়া কবির সহজ উপাসনা-তত্ত্ব আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ইহা সহজসম্প্রদায়ের একখানি

উপাদেয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে সহজ-সাধনের গূঢ় রহস্য বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য ইহার মাঝে মাঝে এমন সব কথা আছে, যাহা আ'জ কালিকার দিনে কেমন কেমন ঠেকিবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আদর্শ পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। বয়স এক শত বৎসরের অনধিক।

Glimpses of Bengal Lifeএর রচয়িতা ও বীরভূম-বিবরণের লেখক প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদেব গ্রন্থে উপাসনা-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

সহজ উপাসনা তত্ত্ব

৶শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস নবরসিক ভক্ত মহাশয় আপনাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নকুল ঠাকুর মহাশয়কে শিক্ষা দিলেন ॥

অষ্টম শ্লোকার্থে দেবী শ্রীশ্রীবাসুল্যাক্তম্। কামং ব্রহ্মময়ং পরং পরপরং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডজাতং কামদ্বয়ং প্রকৃতয়ঃ কৃতয়ো ক্রীড়ন্তি স্বেচ্ছাময়ম্, কামং সর্ব্ববসাদিভিশ্চ সমূলং সাবঙ্গরঙ্গাসৌ কামং সর্ব্বস্থনিত্যয়া বিহরতি কামং পরং ধীমহি ॥

জয় জয় সর্ব্বাদি বস্তু রসবাজ কাম।
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস নিত্যধাম ॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আব মহাঅপ্রাকৃতে।
বিহার কবিছ তুমি নিজ স্বেচ্ছামতে ॥
স্বয়ং কাম নিত্য বস্তু বসরতিময়।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয় ॥
এক বস্তু পুরুষপ্রকৃতিরূপ হৈয়া।
বিলাসহ বহু রূপ ধবি দুই কায়া ॥
তুয়ার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম।
মোর দেহে কৃপা করি স্ফুর অবিবাম।
নব রসিক ভক্তগণে কোটি পরণাম।
মো অধম প্রতি সভে হয় দয়াবান্ ॥
তরুণীরমণ কহে রসিকচরণে।
সভে দেহ পদধূলি করিএ ভোজনে ॥ * ॥

শুন শুন রসিক ভকত বন্ধুগণ।
চণ্ডীদাস নকুলে দিলেন প্রেমাঞ্জন ॥
রামা রজকিনী সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রীত।
নকুলে পাঠাল্য রাজা বুঝাইতে হিত ॥
বাজা কহে বাণীতুল্য বিদ্বান্ চণ্ডীদাস।
সর্ব্বদেশপূজনীয় নাহি তার হ্রাস ॥
আমার পণ্ডিত তিহ বিদ্যাশিবোমণি।
সকল করিল নাশ বামা বজকিনী ॥
রাজা না জানএ দেবীব হইআছে কৃপা।
তাহা না জানিঞা সভে কহে কামখেপা ॥
এক অংশ বাসুলী জে রামা রজকিনী।
চণ্ডীদাসে কৃপাবান্ হএছে আপনি ॥
বহিত হইএ আছে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
নকুলে ডাকিএ রাজা করএ সম্ভাষ ॥
সভামধ্যে কহে রাজা শুন হে নকুল।
চণ্ডীদাস বিনে আমি হএছি আকুল ॥
রহিত করিলু তারে ধোবিনী ছাড়িতে।
তভু না ছাড়িল চণ্ডীদাস কোনমতে ॥
উদ্ধার করিব তারে পতিত হইতে।
জায় হে নকুল চণ্ডীদাসের সাক্ষাতে ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী করি অনুমতি লৈয়া।
চলিলা নকুল মনে হরষ হইয়া ॥

যথা চণ্ডীদাস আছে রামিনী সহিত।
নকুল আসিএ তথা হৈল উপনীত ॥
তাহারে দেখিএ তবে রামা রজকিনী।
সম্ভ্রম হইএ ঘরে গেলা জে ঐমনি ॥
নান্নুড় গ্রামেতে বাসুলীর ঈশান কোণেতে।
চণ্ডীদাসের বাসাঘব আছএ সেথাতে ॥
র.মা রজকিনীর ঘর সেথান হইতে।
দক্ষিণেতে এক পুঅা নিকট সাক্ষাতে ॥
যদি কহ একত্রেতে না থাকএ কেন।
পীবিতের রীতি নহে স্বকীয়াকরণ ॥
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ স্বকীয়াতে নাই।
কেবল সম্ভোগ মাত্র প্রেম নাহি পাই ॥
নকুল প্রণাম কহি কহিল বৃত্তান্ত।
চণ্ডীদাস সকল বুঝিল আদ্যোপান্ত ॥
ধোবিনী ছাড়হ ভাই জাতে উঠ তুমি।
শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম আমি ॥
ইহা শুনি নিশ্বাস ছাড়এ চণ্ডীদাস।
ছাড়িতে নাবিব ধোবিনীর প্রেমফাঁস ॥
ধোবিনীর প্রেমে আমি হইআছি ভোব।
জাতি পাতি জ্ঞাতি বন্ধু ধোবিনী সে মোব ॥
এ দেহ সঁপেছি আমি ধোবিনীর পায়।
সকল সম্পদ মোর অন্ত নাহি তায় ॥
সর্ব্বস্ব ধোবিনী মোর এ ভূমি আকাশ।
ধোবিনী ছাড়িলে মোর প্রাণে নাহি আশ ॥
আমি দেহ সেহ প্রাণ শুন ওরে ভাই।
পরাণ ছাড়িএ গেলে দেহ রবে নাঞি ॥
ধোবিনী ধোবিনী বলি আনন্দ হইআ।
নকুলে করিলা কোলে রামিণী বলিআ ॥
চণ্ডীদাসের স্পর্শমাত্র নকুল ঠাকুর।
জত দুর্ব্বাসনা তার সব হৈল দূর ॥
নকুল কহএ গোঁসাঞি কৃপা কর মোরে।
জাতি পাঁতি সর্ব্ব মোর জাউ ছারখারে ॥

চণ্ডীদাস কহে জার রামিনীর ঠাঞি।
তিহুঁ জা করিবেন আমি করিব তাহাই ॥
ইহা শুনি নকুল ধোবিনীর বাড়ী গেলা।
জাইএ দেখএ চণ্ডীদাস সনে মেলা ॥
আশ্চর্য্য হইল তবে নকুল ঠাকুর।
কোন পথে আইল [তিঁহ] হইএ আন্তর ॥
দেখিএ বিস্ময় নকুল হইল তথায়।
অষ্টাঙ্গ হইএ পড়ে রজকিনীর পায় ॥
উঠ উঠ বলি রামা নকুল ঠাকুরে।
দু করে ধবিএ বসায়ন নিজ কোরে ॥
অস্পর্শী রজকী [আমি] তুমি ত ব্রাহ্মণ।
মোর পাএ দণ্ডবত কর অকারণ ॥
নকুল কহএ তোমায় জে কহে ধোবিনী।
ত্রিভুবনমধ্যে হয় মহাপাতকিনী ॥
মোবে অনুগ্রহ কব তোমবা দুজন।
জাতি পাঁতি জ্ঞাতি মোর নাহি প্রয়োজন ॥
রাজা কুটুম্বাদি ঘণে (গণে ?) সকলে কহিবে।
কহিবে তোমাদের বাক্যে কুলেতে উঠিবে ॥
বামা চণ্ডীদাস দুহে তারে আজ্ঞা দিলা।
মহানিশাকালে তুমি আসিবে একলা ॥
সম্ভোগ সাধন তোমায় দেখাব শিখাব।
মহাঅপ্রাকৃত নিত্যকুলেতে উঠাব ॥
আশ্বাসিএ নকুলেরে বিদাই করয়।
তরুণীরমণ কহে শুন ভক্তচয় ॥

প্রথম স্তবক ॥

নকুল বিদাই হই বৃত্তান্ত কহিল।
কুটুম্বাদি রাজা শুনি আনন্দ পাইল ॥
দিবসান্তে হৈল তবে অধিক রজনী।
একলা আইলা যথা চণ্ডীদাস রামিণী ॥
অষ্টাঙ্গ হইল তবে নকুল ঠাকুর।
দহে অনুকূল তারে হইলা প্রচুর ॥

কামরতি গায়ত্রীবীজে করিলা আশ্রয়।
আশ্রয় করি রতিকামতত্ত্ববস্তু বয় ॥
প্রথমে কহেন তারে কাম রতি ভেদ।
জাহা শুনি মানসের ঘুচে ধন্ধ খেদ ॥
কাম কৃষ্ণ রতি রাধা শুন হে নকুল।
অহিংসা হইলে দুহে হয় অনুকূল ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি জত দেহ হয়।
রতি কাম সর্ব্বদেহে বিলাস করয় ॥
সর্ব্ব আদি বৃত্তান্ত শুনহ একমনে।
সর্ব্ব আদি নিত্য বস্তু আছে মর্ম্মস্থানে ॥
মহারস নিত্যবৃন্দাবন সেই ধাম।
মহা অপ্রাকৃতে রমে সেই স্বয়ং কাম ॥
তাহা হৈতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উপজিল।
সেই রজবীজ হৈতে সর্ব্ব সৃষ্টি হৈল ॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃত।
ত্রিবিধ বিহার তার শুনহ নিশ্চিত ॥
সেই রজবীজ হৈতে নিশ্চয় জানিহ।
* * * আর অন্য নহে কেহ ॥
সেই কাম রজবীজ রস রতি সত্তা।
সেই সর্ব্বরসময় সর্ব্বময় কর্ত্তা ॥
ধারণ পোষণ রস বিনে অন্য নাঞি।
অহিংসা হইলে বস্তু সিদ্ধতত্ত্ব পাই ॥
সেই রজবীজ হৈতে সর্ব্ব দেহ হয়।
ঈর্ষা কর্ষা তাপ আদি ছাড়হ নিশ্চয় ॥
সেই রস প্রাকৃত অপ্রাকৃত শুন কহি।
রসের হইলে ভক্ত নিন্দা হিংসা নাহি ॥
সকল ব্রহ্মাণ্ড রস রস গুরু কয়।
কোথায় করহ নিন্দা গুরুনিন্দা হয় ॥
প্রাকৃত রূপেতে তিহু হএন বিস্তার।
মহা অপ্রাকৃত রূপে নিত্যবস্তু সার ॥
ইহা শুনি নকুল কহএ শুন প্রভু।
কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি কভু ॥

কৃপা করি সবৃত্তান্ত কহিবে আমায়।
এই নিবেদন আমি কৈলু তব পায় ॥
ইহা শুনি চণ্ডীদাস নকুলেরে কয়।
সেই রস এই দেহে বর্ত্তমান হয় ॥
দেখ জেন ইক্ষুরস দ্রবের সমান।
অনলের যোগে দেখ হয় বর্ণ আন ॥
দেখ জেন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করি।
অগ্নি আবর্ত্তন করে অতি যত্ন করি ॥
অনলের জ্বালেতে বিরাগ জে উঠয়।
বিরাগ নির্ম্মল হএ রজগুড় হয় ॥
সেই গুড় মোদকেতে পুন লৈয়া জায়।
গাঞ্জ যোগ দিআ পুন বিকার ঘুচায় ॥
গাঁজযোগ সাঙ্গ হৈলে ভুরা তার নাম।
সূর্য্যাগ্নিতে পুনরপি করএ শুখান ॥
অনলে চাপায় পুন দিএ দুগ্ধ যোগ।
নির্ম্মলতা হয় তার জায় গাদ রোগ ॥
শুভ্রবর্ণ হয় রস নাম তার চীনি।
তস্য পর ভিআনেতে ওলা লাড্ডু খানি ॥
পুন দুগ্ধ যোগ দিএ তাহার ভিয়ান।
অখণ্ড লড্ডুকা হয় মিশ্রী তার নাম ॥
তারপর দুগ্ধ যোগে ভিআন করয়।
সিতামিশ্রী নাম তার নির্ব্বিঘ্নে তা হয় ॥
অখণ্ড মধুর রস সিতামিশ্রী নাম।
হেমবর্ণ বরিষণ হয় অবিরাম ॥
সর্ব্বাদ্য সে নিত্যরস নিত্যেতে রময়।
গোপনেতে দুহা অঙ্গে বরিষণ হয় ॥
সেই রস মহাঅপ্রাকৃত তার নাম।
বিহারে বরিষে রস সদা অবিশ্রাম ॥
দুহু দোহ বিশ্রাম সেই উজ্জ্বল বিকার।
ডগমগ দুহু অঙ্গ শত শুদ্ধ সার ॥
রাধাকৃষ্ণ রসপ্রেম একুই সে হয়।
নিত্য নিত্য ধ্বংস নাই নিত্য বিরাজয় ॥

মধুর হইলে রস জরা মৃত্যু নাই।
রাধাকৃষ্ণ বিহরএ দেহে সর্ব্বথাই ॥
মৃত্যুকে করিএ জয় জায় নিত্যস্থান।
নিত্য সহ (?) প্রায় তার হয় অবস্থান ॥
মধুর শৃঙ্গার রস দেহে জনমিলে।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যবস্তু প্রাপ্তি সেই কালে ॥
মধুর শৃঙ্গাররসে বর্ত্তমান হয়।
মহা মহাপ্রলয়াদি নাহি তার ভয় ॥
তরুণীরমণ কহে ভক্তগণপায়।
প্রেমসমাধি সিদ্ধ হৈলে নিত্য সিদ্ধে জায় ॥*॥

মহারূপাবান নেত্রে (?) করিএ আশ্বাস।
সাধন উপায় তবে কহে চণ্ডীদাস ॥
এই দেহে প্রাকৃত রস দ্রব দুগ্ধ হয়।
অগ্নি আবর্ত্তন হৈতে হৈতে শুদ্ধ হয় ॥
এই রস কর তুমি অগ্নি আবর্ত্তন।
অখণ্ড মধুর হবে শুদ্ধ হৈলে মন ॥
ইহার অনল হয় প্রকৃতির সঙ্গ।
ক্রমে ক্রমে বিরাগ জাইএ হবে বঙ্গ ॥
প্রকৃতি অনলে রস কর আবর্ত্তন।
স্বভাব ধীরতা হএ গুরুকে স্মরণ ॥
সম্বৎসর দিন আগে ধৈর্য্য হৈলে মন।
গাঢ় রতি দিনে দিনে হইবে তখন ॥
চারি মাস আগে তার চরণ সেবিআ।
পদতলে সুতি রবে স্বভাব লইআ ॥
পুন আর চারি মাস চরণ সেবিআ।
বামভাগে সুতি রবে স্বভাব লইআ ॥
পুনরপি চারি মাস সর্ব্বাঙ্গ সেবিআ।
ছন্দে বন্দে সুতি রবে স্বভাব লইআ ॥
আর চারি মাস তার চরণ সেবিএ।
হৃদএ রাখিবে তারে স্বভাব লইএ ॥
পুন আর চারি মাস যন্ত্রে যন্ত্র দিএ।
সুস্থির হইএ রবে গুরু স্মঙরিএ ॥
আর চারি মাস হয় সর্পের শৃঙ্গার।
চন্দ্রঘরে নিঃশ্বাসেতে শোষণ তাহার ॥
এই মত করণেতে রতি স্থির হবে।
সাবধান হোএ চন্দ্র চালন করিবে ॥
সুজাতি সর্পের হয় জেমন গমন।
তেন মতে নিজ যন্ত্র করিবে চালন ॥
তাহাতে যগুপি রতি শূন্য হোতে চায়।
চন্দ্রঘরে গুণিএ লইবে উর্দ্ধ বায় ॥
কামগায়ত্রী কামবীজ মনে স্মঙরিবে।
ক্রোড়াগত বন্দেতে শৃঙ্গারসুখ দিবে ॥
তারপর হৃদে রাখি করিবে শৃঙ্গার।
তাহাতে অধিক সুখ হইবে দুহার ॥
আসিতে চাহিলে বস্তু স্থিরতা হইবে।
চন্দ্রের ঘরেতে উর্দ্ধে নিঃশ্বাসে তুলিবে ॥
ঈশ্বরের ঘর এই ঈশ্বরের শৃঙ্গার।
মানুষের ঘর আছে সকলের পার ॥
তরুণীরমণ কহে শুন ভক্তগণ।
সভে কৃপা করি দেহ মধুরস ধন ॥*॥

ইবে কহি মানুষসাধনতত্ত্বকথা।
তাহার আস্বাদে জায় হৃদয়ের বেথা ॥
আপনার স্বভাব সপিবে তার স্থানে।
তাহার স্বভাব নিবে করিএ যতনে ॥
শৃঙ্গার ছাড়িএ তার সুতি রবে বামে।
তাহাকে আপনা মানি রবে শুদ্ধমনে ॥
তাহারে নাএক রসরাজ মনে করি।
তাহারে আপন জ্ঞানে হইবে সুন্দরী ॥
তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করি ভাবে রবে।
মন্ত্রবিদ্যা আদি করি আপনা ভুলিবে ॥

আপনে উঠিএ তিহ্ন করিবে শৃঙ্গার।
সেই দিনে শুদ্ধ হবে মানুষশৃঙ্গার॥
শৃঙ্গার সাক্ষাৎ রসরাজ রাধাকৃষ্ণ।
বর্ত্তমান সদত থাকিবে হোএ তুষ্ট॥
মধুর মাধুর্য্য রাধা হৃদয়ে রহিবে।
মহাঅপ্রাকৃত রস বরিষণ হবে॥
নাএকস্বভাব বস যাবৎ থাকয়।
মধুর মাধুর্য্য বস তাবৎ না হয়॥
অপ্রাকৃত প্রকৃতি স্বভাবসিদ্ধ হৈলে।
কৃষ্ণ বশী হয় সদা শুনহ সকলে।
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার কৃষ্ণ রস অক্ষুবান॥
সে জন হইবে বশ শুনহ বিধান॥
কেমনে হইবে শুন কহিএ বিধান।
নিজনারী সহ কর সাধন ধিআন॥
আগেতে পক্কতা হআ নিজনারী সহ।
সিদ্ধ হআ কর পরকীয়া প্রেম লেহ॥
পুন কহি শুন ভাই সাধন পত্তন।
অপক্কেতে পরকীয়া নরকে গমন॥
শৃঙ্গার সাধন তাহার কবণ
শুনহ করিএ মন।
স্বকীয়াব সহ বাড়াইএ নেহ
কর রসআবর্ত্তন॥
স্বকীয়াব রাগে ষড় ঋতু আগে
সুস্থির করিএ মন।
যন্ত্রে যন্ত্র পুরি গুরুকে স্মঙরি
কর নামের জপন॥
হৃদএ রাখিবে হৃদএ থাকিয়ে
স্থিরতা করিএ মতি।
গুমরি গুমরি পক্কতা হইবে
অপক্ক এ দেহরতি॥
ষড় ঋতু পুন করিবে সাধন
গুরুমন্ত্র জপনেতে।
আপনা ভুলিবে গুরুদেহ নিবে
জীবরতি জাবে তাথে॥
শুন মহাভাগ পুন ষড় রাগ
জপন জে মূলমন্ত্র।
গুরু কৃষ্ণ হবে সে দেহ পাইবে
স্থকিত চালন যন্ত্র॥
পুন ষড় ঋতু সাধন করিবে
কামগায়ত্রী কামবীজে।
তিনে এক করি একতে রহিবে
সে দেহ ধরিএ নিজে॥
প্রতি জপনেতে উভয় যন্ত্রেতে
মন্থন সাধিবে ভাই।
সপ্ত এক করি সে বস্তু মাধুরী
পক্কতা হইবে তাই॥
স্বভাব ছাড়িএ স্বভাবাদি লৈএ
পুন ষড় ঋতু ববে।
মধুর আনন্দ গোপনে বর্ষণ
দুহু অঙ্গ না লড়িবে॥
পিআ নিত্য রস মধুরবিলাস
উজ্জ্বল দুহারি অঙ্গ।
তরুণীরমণ কহএ সঘন
অপার রসের রঙ্গ॥ * ॥
স্বকায়াতে জীবদেহ সাধন করিআ।
পক্কতা হইএ সাধন কর পরকীয়া॥

পদং॥

পক্কতা না হএ পীরিতি করে।
দুকুল হারায়ে পড়এ ফেরে॥
মহা কষ্ট পাএ নরকে রয়।
পীরিতি ভজন কভু না হয়॥
ব্রজ অনুসার জেমন রীত।
না বুঝি করএ সকাম প্রীত॥

সকাম কামেতে কামুকী নারী।
লোএ ফিরএ সঙ্কেত করি ॥
তাহাতে জগৎ নিন্দিত হয়।
ভ্রষ্টাচারী বলি সকলে কয় ॥
প্রেম প্রীত চিন্তা তাহাতে নাই।
সামান্য চিন্তাতে ভ্রমে সদাই ॥
হিংসা নিন্দা আদি বেড়এ আসি।
কুক্রিয়া কুভাষা সদত ঘুষি ॥
দেখহ এ পথ বিচার করি।
কেবা ভ্রমিঞাছে লোইএ নারী ॥
ব্রজের সহজ জেমন রীত।
নিজঘরে রহি করিল প্রীত ॥
সংযোগে পীরিতি ভজন করে।
অসংযোগে প্রেম মনন ধরে ॥
গুরু দুরজন গঞ্জএ জত।
প্রেমানন্দ বাগ বাঢ়এ তত ॥
গুরুজনা আদি ভএতে বহে।
দেখি দেখি প্রাণ সদত চাহে ॥
কভু বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ কভু।
সদাই চিন্তএ পীরিতি প্রভু ॥
জলাদি ছলনে চলিএ জায়।
নির্জ্জনে জাইএ মিলে দুহায় ॥
কহএ তরুণীরমণ তাই।
কত প্রেম বাঢ়ে ওর না পাই ॥ * ॥
এই ত কহিনু শুদ্ধ সহজ বিধান।
ইবে কহি প্রেমরতির লক্ষণানুষ্ঠান।

পদং ॥

রাধার লক্ষণ   ধরএ জে জন।
এমন নায়িকা দেখি।
তনু মন প্রাণ   করি সমর্পণ
সে রূপ হৃদয়ে রাখি ॥

বয়স কৈশোর   চাঁচর চিকুর
সুদীর্ঘ হইব অতি।
বঙ্কিম চাহুনী   হাস্য সুবদনী
বচন মধুর জিতি ॥
কমল চরণ   স্থলপদ্ম জেন
সুকোমল সারাসার।
জবার কলিকা   জিনি অঙ্গুলিকা
অতি সুশোভন আর ॥
প্রেমপুলকিত   সে দেহ সদত
পীরিতি জানএ সার।
নআন বাহিয়া   পুলক হইআ
পড়ে প্রেমজলধার ॥
সুমৃদু বচন   কহে সর্ব্বক্ষণ
অতি সুরোদন মিলে।
সদানন্দময়   সদা বিহবয়
কৃষ্ণপ্রেমের হিল্লোলে ॥
কিশোরীর ভাব   আর অনুরাগ
সেই সুবদনী ধরে।
নাহি জানে আন   প্রিয় অঙ্গ ধ্যান
সদা বিরহ অন্তরে ॥
এই ত নায়িকা   তত্ত্বের অধিকা
সপ্তগুণাশ্রিত সেই।
তরুণীরমণ

* * *

স্বামীর সেবাতে জে ধনী রত।
সেই প্রেমবতী জানএ প্রীত ॥
সে ধনী যদ্যপি পীরিতি করে।
তনু মন প্রাণ সঁপিবে তারে ॥
পীরিতি ভজন হইবে পূর্ণ।
প্রেমে প্রেমধন পাইবে তূর্ণ ॥

নিজস্বামী নিন্দা জে নারী করে।
প্রেমী নহে কামী বলিএ তারে ॥
পীরিতি কর‍্য না তাহার সনে।
সে নারী মারিস্ত পারএ প্রাণে ॥
তরুণীরমণ কহএ ভাই।
এমন পীরিতি করিহ নাই ॥ * ॥

জাতের বিচার নাহিখ করে।
রমণ লাগিএ সদত ফিরে ॥
তরুণীরমণে এই সে কয়।
বিচারিএ প্রেম করিতে হয় ॥ * ॥
এই ত কহিনু তোমায় শুনহে নকুল।
পীরিতিসাধনতত্ত্ব বিধান এই মূল ॥

রসিক রমণী মিলাবে জে।
তাহারি চরণে সঁপিবে দে ॥
মিলাইএ দিএ সুখ জে পায়।
সেই প্রাণবন্ধু বিকাবে পায় ॥
অন্তের আলাপে ক্রোধ জে করে।
স্পর্শ না করিএ তেজিবে দূরে ॥
ভকতি করিএ সকাম কামে।
কত ছল করি সকামে রমে ॥
বৃন্দা আদি করি সকামী নারী।
ভুলায় নাগর ভকতি করি ॥
তার রস রতি মথিআ নিএ।
চিকণ করএ আপন গাএ ॥
জেমন জোখেতে শোণিত খায়।
তেমন সে নারী জানিবে তায় ॥
তাহার আদরে জে জনা ভুলে।
সে জনা আপনা হারাল হেলে ॥
বহু কান্তভোগী রোগে হয়।
শুনহ চতুর রসিকচয় ॥
তার ঋতুপদ্মে জনমে কীটে।
বীর্য্য না পাইএ পদ্মকে কাটে ॥
তাহার কামড়ে বাউলী প্রায়।
যথা তথা সদা শৃঙ্গার চায় ॥
শৃঙ্গারেতে জত বীর্য্য সে পায়।
পদ্মে বসি তাহা কীটেতে খায় ॥

পয়ার ॥

সহজ শৃঙ্গার রূপ মদনতরঙ্গ।
শৃঙ্গার সহজ রূপ আপনি অনঙ্গ ॥
মদন অনঙ্গ কৃষ্ণ শৃঙ্গার আকৃতি।
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার কৃষ্ণ মদনমূরতি ॥
জিহু শৃঙ্গার তিহু কৃষ্ণ বুঝহ মরমে।
সহজ রসিক হৈলে জানএ যতনে ॥
সহজ মানুষ হৈলে জানএ শৃঙ্গার।
তবে সে দেখিতে পাবে শৃঙ্গার আকার
শৃঙ্গারমাধুরী কৃষ্ণ জে জন জানিবে।
সহজ মানুষতত্ত্ব সে জনা পাইবে ॥
বিশ্বাস হইব জার পাইবা সে জনা।
অবিশ্বাস হৈলে হবে নরকযাতনা ॥
মর্ম্ম না জানিলে কেহ না জানে ভজন।
ভজন না জানিলে হয় বৃথাই জনম ॥
মায়াবশে বন্দী হয় নানা যোনি ফিরে।
ঈশ্বর মায়ার বশে জানিতে না পারে ॥
কদর্য্য ভক্ষণ করে নাহি জানে দুঃখ।
আপনার দেহে সেহ মানে মহা সুখ ॥
মহাসুখ নির্ম্মল শৃঙ্গার না জানিঞা।
নানা যোনি ভ্রমণ করএ ভ্রান্ত হয়া ॥
নির্ম্মল শৃঙ্গার সামরস অফুরান।
ইহা না জানিঞা মাত্র অধঃপাতে জান ॥
প্রকৃতি পুরুষ হয় রমণ কারণ।
রমণ না জানিলে কেহ না জানে মরম ॥

অতঃপর কহি শুন আশ্রয় নির্ণয়।
কে কার আশ্রয় হয় শুনহ নিশ্চয়॥
প্রকৃতি পুরুষ এই দুই দেহ হয়।
উভয়েতে দুহে দুহার হএন আশ্রয়॥

অথ কথা॥ পুরুষ কাব আশ্রয়। প্রকৃতিব আশ্রয়॥ প্রকৃতি কার আশ্রয়। পরকীয়ার আশ্রয়॥ পরকীয়া কার আশ্রয়। দেহরতিব আশ্রয়॥ দেহরতি কার আশ্রয়। কামবতির আশ্রয়॥ কামরতি কাব আশ্রয়। শৃঙ্গাববতিব আশ্রয়॥ শৃঙ্গাররতি কার আশ্রয়। সুখ-বতিব আশ্রয়॥ সুখরতি কাব। ভাববতিব॥ ভাববতি ' কাব। প্রেমরতিব॥ প্রেমরতি কাব। কৃষ্ণরতির॥ কৃষ্ণবতি কাব। শ্রীবাধাব॥ শ্রীবাধা কার। প্রেমবসেব॥ প্রেমরস কার। মানুষের॥ মানুষ কাব। সহজের॥ সহজ কাব। বসিকের॥ রসিক কাব। সামান্য মানুযেব॥

পদং॥

সামান্য মানুষ কে।
সহজে পশেছে জে॥
সহজে পশিল জাবা।
কেমনে সামান্য তাবা॥
কেমনে সামান্য হয়।
সামান্য আচারময়॥
উত্তম সামান্য হয়া।
সহজে পশিল জায়া॥
সহজ বুঝিবে কে।
আপনা জানিল জে॥
আপনা জেমন জানে।
সহজে রাখিল প্রাণে॥
সহজ মদন রতি।
শৃঙ্গার ভাবক নিতি॥
শৃঙ্গার বিলাসময়।
সদাই আনন্দে রয়॥
বুঝিআ আনন্দ বস।
সদাই তাহার বশ॥
কে তাহা কহিতে পাবে।
পীবিতি লাগিয়া ঝুরে॥
নয়ানে নয়ানে বাগ।
সেই সে প্রেমেবি দাগ॥
পহিল নয়ানে প্রীত।
হিয়ায় হিয়ার চিত॥
প্রীতিএ হানিল বাণে।
বসিক সঁপিল প্রাণে॥
চতুর্থে মরমে ভোব।
পঞ্চমে রসেরি চোর॥
শৃঙ্গাব রতিতে ভোবা।
তিলে শতবার হারা॥
তরুণীবমণে কয়।
শুনহ বসিকচয়॥ *॥

পয়ার॥

সহজ পরকীয়া রস পরম উল্লাস।
ব্যক্ত করি লিখিলে হইব সর্ব্বনাশ॥
অতি গুহ্য এই সব ব্যক্ত কভু নয়।
ব্রহ্মাণ্ডের অগোচর কহিল নিশ্চয়॥
উজ্জ্বল পরকীয়া রস সর্ব্বোত্তমোত্তম।
বেদবিধি অগোচর শুনহ বচন॥
রসিকের মনে সদা পরকীয়া স্থিতি।
তরুণীরমণে কহে শুনহ যুকতি॥ *॥

অথ স্থায়ী ১। স্থিতি ২। বিলাস ৩। স্থায়ী শৃঙ্গার ১। স্থিতি পীরিতি ২। বিলাস সম্ভোগ ৩। যথা স্বয়ং ১। রূপ ২। প্রকাশ ৩। স্বয়ংপ্রেম ১। রূপ রস ২। প্রকাশ শৃঙ্গার ৩।

অথ আশ্রয় ১। আলম্বন ২। উদ্দীপন ৩। আশ্রয় প্রকৃতি ১। আলম্বন বিলাস ২। উদ্দীপন শৃঙ্গার ৩॥

অতি গুহ্য এই কথা নির্দ্ধার কহিল।
রসিক এ কথা শুনি আনন্দ পাইল॥
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
মদনতরঙ্গ মূর্ত্তি আনন্দ অপার॥
রসিকের দেহ হয় রসের আকৃতি।
রসময় মূর্ত্তি সেই আনন্দমূরতি॥
জিহ রস তিহু কৃষ্ণ আনন্দ আখ্যান।
সেই রস এই দেহে আছে মূর্ত্তিমান॥
মর্ত্তিমন্ত হএ রস বিহরে আপনি।
রসিকে জানএ ইহা অন্যে নাই জানি॥
সমগ্র (?) মানুষ জারা এই তত্ত্ব জানে।
রস মর্ত্তিমন্ত আছে রসিকের মনে॥

পদং॥

রসিক মূরতি শৃঙ্গার আকৃতি
সহজ মানুষ কে।
রমণ শৃঙ্গার রসিক ভাবন
হইলে হইব সে॥
দুহে দুহা ভাব স্বভাব সঙ্গতি
* * রস।
দুহু দুহা রসে শৃঙ্গার আবেশে
দুহে দুহাকার বশ॥
জে জনা হইবে সে জনা পাইবে
সহজ মানুষ রীত।
অনুরাগ মন রাগের ভাবন
সদা * * প্রীত॥
মধুর শৃঙ্গার সদাই * *
* মধুর মনে।
সহজ প্রকৃতি * * *

* * * সহজই প্রীত
সদাই সহজ মন।
সদাই সহজ হাস পরিহাস
সহজ * জন॥
সহজ দিশেতে সহজ বসতি
সহজ মানুষ সনে।
সহজ * সহজ পীরিতি
তরুণীরমণ ভণে॥ * ॥
এই সব সাধ্যাদি কহিলা চণ্ডীদাস।
ইহা শুনি নকুল মনে হইলা উল্লাস॥
সহজ উপাসনাতত্ত্ব কহিল নির্দ্ধারি।
অতি গোপনীয় কথা কহিতে না পারি॥
জাতি বিজাতি নাই এই প্রেমের হাটে।
সহজ মানুষ তার এক জাতি বটে॥
মানুষে মানুষ আছে রসিকের গণ।
নিশ্চয় জানিহ তারা নিত্যসিদ্ধ জন॥
চণ্ডীদাস নকুলে জাহা শ্লোকে শিক্ষা দিলা।
আপন বুঝিতে কিছু প্রচার করিলা॥
তরুণীরমণ কহে শুন সর্ব্বজন।
বিশ্বাস করিএ সভে করহ গ্রহণ॥ * ॥

বিবিধ রাগাত্মিক পদে, নানা সহজিয়া পুথিতে এবং প্রচলিত প্রবাদে আমরা পাইতেছি, মহাকবি চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ সহজ-সাধক ছিলেন (সহজ-সাধনা বলিতে অধুনা লোকে যাহা বুঝে) ও রজকিনী রামী তাঁহার প্রধান অবলম্বন। বাস্তবিকই কি তাই? ইহাতেও কি সংশয়ের অবসর আছে? আমরা বলি, নাই কেন? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্ত রায়

জৈন-মূর্ত্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ *

এ দেশের মূর্ত্তি-তত্ত্ব (Iconography ও Iconology) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা যেরূপ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেছেন, তাহার তুলনায় আধুনিক কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এ বিষয়ের এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস বা বিবরণ এ দেশে প্রকাশিত হয় নাই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহাশয়, যিনি এই সম্মিলনীর ইতিহাস-শাখার সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি আমাকে জৈন-মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিবার জন্য কয়েকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এবার তাঁহারই আগ্রহে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমার এই প্রথম উদ্যমের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

যে দেবতাকে ভক্তি ও পূজা করা আবশ্যক, সেই দেবতার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করাই মূর্ত্তিতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনেরা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতার ও ধর্ম্মাচার্য্যাদির প্রতিমা ব্যতীত চরণ ও চরণ-চিহ্নেরও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণতঃ যে কয়প্রকার জৈন দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে।

জৈন মূর্ত্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে জৈন দেবতত্ত্ব জানা আবশ্যক। তজ্জন্য আশা করি, তাঁহাদিগের উপাস্য তীর্থঙ্কর অর্থাৎ অর্হন্ত দেবগণ ব্যতীত জৈন মতে দেব ভেদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জৈন শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকার দেবগণের বিভাগ এইরূপ বর্ণিত আছে,—ঊর্দ্ধলোকে—১। বৈমানিক বার প্রকার, ২। কিল্‌বিষ তিন প্রকার, ৩। লোকান্তিক নয় প্রকার, ৪। গ্রৈবেয়ক নয় প্রকার, ৫। অনুত্তরবিমান পাঁচ প্রকার। অধোলোকে— ১। ভুবনগতি দশ প্রকার, ২। পরমাধামিক পনের প্রকার, ৩। ব্যন্তর ও বানব্যন্তর ষোল প্রকার। তির্য্যক্‌লোকে—১। জ্যোতিষ্ক দশ প্রকার ও তির্য্যক্ জৃম্ভক দশ প্রকার, মোট ৯৯ প্রকার এবং পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত-ভেদে সর্ব্ব-সমষ্টি ১৯৮ প্রকার দেববিভাগ আছে। উপরি উক্ত দেববিভাগের ব্যন্তর বিভাগে যক্ষ ও যক্ষিণীরাই তীর্থঙ্কর-দেবের বিশেষ ভাবে সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া জৈনমন্দিরে ঐ সেবক ও সেবিকা দেব-দেবীদিগের মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পূজা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত দেব-বিভাগের মধ্যে বৈমানিক দেবগণের নাম যথাক্রমে এই :—(১) সৌধর্ম্ম, (২) ঈশান, (৩) সনৎকুমার, (৪) মাহেন্দ্র, (৫) ব্রহ্ম, (৬) লান্তক, (৭) মহাশুক্র, (৮) সহস্রার, (৯) আনত, (১০) প্রাণত, (১১) আরণ, (১২) অচ্যুত।

ভুবনপতি দেবগণের বিভাগ যথাক্রমে এইরূপ :—(১) অসুরকুমার, (২) নাগকুমার, (৩) সুবর্ণকুমার, (৪) বিদ্যুৎকুমার, (৫) অগ্নিকুমার, (৬) দ্বীপকুমার, (৭) উদধিকুমার, (৮) দিক্‌কুমার, (৯) বায়ুকুমার ও (১০) স্তনিতকুমার।

---

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দে রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

ব্যন্তর দেবগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ :—(১) পিশাচ, (২) ভূত, (৩) ঋষিবাদী, (৪) ভূতবাদী, (৫) কন্দী, (৬) মহাকন্দী, (৭) কোহণ্ডি, (৮) পয়ঙ্গি।

উপরি উক্ত পিশাচ, ভূত ও যক্ষাদিরও অনেক প্রকার বিভাগ আছে। যথা,—পিশাচ পনের প্রকার, ভূত নয় প্রকার, যক্ষ তের প্রকার, রাক্ষস সাত প্রকার, কিন্নর দশ প্রকার, কিম্পুরুষ দশ প্রকার, মহোরগ দশ প্রকার, গন্ধর্ব্ব বার প্রকার।

জ্যোতিষী দেবতাগণের—(১) সূর্য্য, (২) চন্দ্র, (৩) গ্রহ, (৪) নক্ষত্র ও (৫) তারকা, এই পাঁচটী প্রধান বিভাগ পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত দেবগণের বিস্তৃত বিবরণ "সংগ্রহণীসূত্রে" বর্ণিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ জৈন মন্দিরে উপরি উক্ত সামান্য দেবগণের মূর্ত্তি থাকে না। যে সমস্ত মূর্ত্তি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাই নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

জৈনশাস্ত্রোক্ত বর্ণনানুসারে মূর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করাইয়া, দেবালয় অথবা অপর পবিত্র স্থানে বিধিমত স্থাপন করিয়া, শ্রাবক ও শ্রাবিকারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। সচরাচর জৈনমূর্ত্তিগুলি স্ফটিক, মরকত ইত্যাদি রত্নের ও নানাপ্রকার পাষাণ, ধাতু ও কাষ্ঠ ইত্যাদি উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জৈনমন্দিরে বর্ত্তমান যুগের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে যে কোন এক জন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি "মূলনায়ক" করিয়া বেদির সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা হয় ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি বেদির অন্যান্য স্থানে স্থাপন করা হয়। হিন্দুদিগের দেব-মূর্ত্তি প্রধানতঃ চল, অচল ও চলাচল, এই তিন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু জৈনমূর্ত্তির এরূপ বিভাগ নাই। তাহাদের মধ্যে আবশ্যক হইলে সমস্তগুলিই চল এবং অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ভাবে স্থাপনা করিলে সর্ব্বপ্রকার বিগ্রহই অচল হইতে পারে।

জৈন তীর্থঙ্কর অর্থাৎ অর্হন্তমূর্ত্তিগুলি প্রধানতঃ পদ্মাসন-মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থঙ্করদিগের কায়োৎসর্গমুদ্রার বিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্ত্তিও প্রচলিত আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, দিগম্বর জৈন-দিগের তীর্থঙ্করমূর্ত্তিগুলি বস্ত্রহীন অর্থাৎ দিগম্বর, শ্বেতাম্বর মূর্ত্তিগুলির কটিদেশে সূত্রচিহ্ন ও কৌপীনের চিহ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের কোন কোন জৈনমন্দির তীর্থঙ্করের "অর্দ্ধপদ্মাসন" মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের জৈনমন্দিরে তীর্থঙ্করগণের আর এক প্রকার "চতুর্ম্মুখ" বিগ্রহ পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এই চতুর্ম্মুখের, অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাদ্‌ভাগে, দক্ষিণে ও বামভাগে চারিটী তীর্থঙ্করদেবের মূর্ত্তিগুলির মধ্যভাগে একটী অশোকবৃক্ষ স্থাপন করা হয়। শ্বেতাম্বর মন্দিরে সহস্র কুটমূর্ত্তি অর্থাৎ একটি ফলকে শতাধিক তীর্থঙ্করমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দুই পার্শ্বে দুইটী কায়োৎসর্গ-মুদ্রায় উপরিভাগ ২টী পদ্মাসন ও মধ্যে আর একটী পদ্মাসন, এই পাঁচটী মূর্ত্তি সাধারণতঃ অষ্ট ধাতুতে প্রস্তুত করা হয়, ইহার নাম পঞ্চতীর্থ। এই ২৪টী তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি অষ্ট ধাতুতে থাকিলে তাহাকে চওবিশী পট্ট অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি পট্ট বলা হয়। প্রায় সমস্ত জৈনমন্দিরে

"সিদ্ধচক্র" বা নবপদেরও পূজা হইয়া থাকে। ইহাতে (১) অর্হন্ত ও সিদ্ধের দুইটী "পদ্মাসনমুদ্রার" মূর্ত্তি ২) আচার্য্য,উপাধ্যায় ও সাধু,এই তিনটী "উপদেশমুদ্রার" মূর্ত্তি ও (৩) চারিটী প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ঈশান, অগ্নি, নৈঋ‌র্ত ও বায়ুকোণে যথাক্রমে দর্শন, জ্ঞান, চারিত্র্য ও তপ,—এই চারিটীর স্থাপনা থাকে। প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি মধ্যে কল্পবৃক্ষ সহ পূর্ব্বযুগের "যুগলিক" মূর্ত্তিও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটী বা ততোধিক ইন্দ্রদেবের বা ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি, মূল মন্দির-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিগুলির হস্তে সচরাচর চামর থাকে। কোন কোন স্থলে দ্বাররক্ষক দেবতাদিগের হস্তে স্থূল যষ্টিও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক শ্বেতাম্বর জৈনমন্দিরে এক বা ততোধিক ভৈরব বা দ্বারপালের স্থাপনা থাকে। দ্বারপাল চারি প্রকার,—পূর্ব্বে কুমুদ, দক্ষিণে অঞ্জন, পশ্চিমে বামন ও উত্তর দিকে পুষ্পদন্ত। সাধারণতঃ কেবল একটী নারিকেল বসাইয়া তৈল ও সিন্দূরদ্বারা ক্রমে ক্রমে আয়তন বর্দ্ধিত করা হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়েরা তাঁহাদিগের মন্দিরে ভৈরবের স্থাপন কি পূজা করেন না; তীর্থঙ্করের মাতাগণের মূর্ত্তিও কোন কোন মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত হিন্দুমূর্ত্তিগুলির ন্যায় জৈনমন্দিরে সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তিপূজাও দেখিতে পাওয়া যায়। "অষ্ট মাঙ্গলিক" (স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত্ত, মৎস্যযুগল, দর্পণ, সিংহাসন, কুম্ভকলস, শ্রীবৎস ও সম্পুট) অধিকাংশ শ্বেতাম্বর মূল-মন্দিরের দ্বারের শিরোভাগে খোদিত থাকে। কোথাও বা এই দ্বারের মধ্যভাগে একটী পদ্মাসনের জিনমূর্ত্তিও থাকে—যাহাকে "মঙ্গলমূর্ত্তি" বলা হয়। চতুর্দ্দশ শুভ ও উৎকৃষ্ট স্বপ্ন (যাহা তীর্থঙ্করের মাতারা গর্ভরাত্রে দেখিয়া থাকেন, যথা—হস্তী, বৃষভ ইত্যাদি) প্রায় শ্বেতাম্বর-মন্দিরে উপযুক্ত স্থানে অঙ্কিত পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কেবলী, শ্রুত-কেবলী, প্রাচীন ও আধুনিক প্রাভাবিক আচার্য্যগণের কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা চরণ রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। জৈন উপাস্য দেবীদিগের মধ্যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। তাঁহারা ভুবনপতি দেবজাতীয়, কিন্তু তির্য্যক্‌লোকে বাস করেন ও তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে,—(১) রোহিণী, (২) প্রজ্ঞপ্তি, (৩) বজ্রশৃঙ্খলা, (৪) বজ্রাঙ্কুশা, (৫) চক্রেশ্বরী, (৬) পুরুষদত্তা, (৭) কালী, (৮) মহাকালী, (৯) গৌরী, (১০) গান্ধারী, (১১) সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা, (১২) মানবী, (১৩) বৈরোট্যা, (১৪) অচ্ছুপ্তা, (১৫) মানসী, (১৬) মহামানসী। বলা বাহুল্য, হিন্দুদিগের মত জৈন পূজাদিতেও নবগ্রহ ও ইন্দ্র, অগ্নি যম, নৈঋ‌র্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্ম ও নাগ, এই দশ দিক্‌পাল ও সোম, যম, বরুণ, কুবের, এই চারিটী লোকপালেরও স্থাপনা করিয়া পূজা হইয়া থাকে। দিক্‌পালগণও ভুবনপতি দেবশ্রেণীর অন্তর্ভূত। এতদ্ব্যতীত ৯টী নিধান-দেবতা ও ৪টী বীর দেবতার পূজা দেওয়া হয়। নবনিধান ও বীর-দেবগণ ব্যন্তর শ্রেণীভুক্ত। নবনিধান দেবগণের নাম যথাক্রমে—(১) নৈসর্প, (২) পাণ্ডুক, (৩) পিঙ্গল, (৪) সর্ব্বরত্ন, (৫) মহাপদ্ম, (৬) কাল, (৭) মহাকাল, (৮) মানব ও (৯) শঙ্খ। বীর-দেবগণের নাম (১) মানভদ্র, (২) পূর্ণভদ্র, (৩) কপিল ও (৪) পিঙ্গল।

প্রসিদ্ধ Indian Antiquary নামক পত্রিকার Vol. XIIIএর ২৭৬ পৃষ্ঠায় ডাঃ বার্জেস সাহেব লিখিয়াছেন যে, জৈনদিগের প্রত্যেক তীর্থঙ্করের দুইটী করিয়া সেবিকাদেবী (একটী যক্ষিণী ও একটী দেবী) থাকে, ইহা ঠিক নহে। এ বিষয়ে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরসম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। কেবলমাত্র কয়েকটী নামের ও চিহ্নের ইতরবিশেষ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় মতে প্রত্যেক তীর্থঙ্করের একটী করিয়া যক্ষ ও একটী করিয়া যক্ষিণী থাকে, যক্ষিণী ও দেবী পৃথক্ নহে। ইহাঁদিগকে শাসন-যক্ষ ও শাসন-যক্ষিণী বা দেবী বলা হয়।

পরিশেষে জৈনদিগের একখানি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ "প্রবচনসরোদ্ধার" নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থঙ্করগণের শাসন, যক্ষ-যক্ষিণীর বিবরণ, মূল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহ পাঠকগণের গোচরার্থ উদ্ধৃত করা হইল।

উক্ত গ্রন্থের ষড়্বিংশতি ও সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত জৈনমূর্ত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্তরে তাহা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১)

গোমুখোযক্ষঃ স্বর্ণবর্ণো গজবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদাক্ষমালিকাযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো মাতুলিঙ্গ-পাশান্বিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১ ॥

গোমুখযক্ষ,—স্বর্ণবর্ণ, হস্তিবাহন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষমালা এবং বাম করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ (ফলবিশেষ, হিন্দী নাম "বিজোরা", অনেকটা মোচার মত) ও পাশ শস্ত্র।

(২)

মহাযক্ষশ্চতুর্ম্মুখঃ শ্যামবর্ণঃ করিবাহনোঽষ্টপাণির্বরদমুদ্গরাক্ষসূত্রপাশান্বিতদক্ষিণপাণিচতুষ্কো মাতুলিঙ্গাভয়াঙ্কুশশক্তিযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২ ॥

মহাযক্ষ—চতুর্ম্মুখ, শ্যামবর্ণ, হস্তিবাহন ও অষ্টপাণি, ইঁহার দক্ষিণের চারিটী হস্তে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা, মুদ্গর, অক্ষসূত্র ও পাশ আছে। চারিটী বাম হস্তে ক্রমশঃ মাতুলিঙ্গ, অভয়মুদ্রা, অঙ্কুশ (শস্ত্রবিশেষ) ও শক্তি (অস্ত্র)।

(৩)

ত্রিমুখোযক্ষস্ত্রিবদনস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণো ময়ূরবাহনঃ ষড়্ভুজো নকুলগদাভয়যুতদক্ষিণকরত্রয়ো মাতুলিঙ্গনাগাক্ষসূত্রযুতবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ৩ ॥

ত্রিমুখ যক্ষ,—ত্রিমুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, ষড়্ভুজ। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে নকুল (অস্ত্রবিশেষ), গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, নাগ ও অক্ষসূত্র।

(৪)

ঈশ্বরোযক্ষঃ শ্যামকান্তির্গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশান্বিত-বামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর যক্ষ,—শ্যামকান্তি, হস্তিবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণকরদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বামপাণিদ্বয়ে নকুল ও অঙ্কুশ ॥ ৪ ॥

(৫)

তুম্বুরুঃ শ্বেতবর্ণো গরুড়ারূঢ়শ্চতুর্ভুজো বরদশক্তিযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো গদানাগপাশযুতবাম-পাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৫ ॥

তুম্বুরু যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, গরুড়বাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ ভুজ দুইটিতে বরমুদ্রা ও শক্তি অস্ত্র এবং বাম হস্ত দুইটীতে গদা ও নাগপাশ।

(৬)

কুসুমোযক্ষঃ নীলবর্ণকুরঙ্গবাহনশ্চতুর্ভুজঃ ফলাভয়যুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবাম-পাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৬ ॥

কুসুম যক্ষ,—নীলবর্ণ, কুরঙ্গবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(৭)

মাতঙ্গোযক্ষঃ নীলবর্ণো গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো বিল্বপাশযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশযুতো বাম-পাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৭ ॥

মাতঙ্গ যক্ষ,—নীলবর্ণ, গজবাহন, চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করদ্বয়ে বিল্ব (ফলবিশেষ) ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল এবং অঙ্কুশ।

(৮)

বিজয়োযক্ষঃ হরিদ্বর্ণস্ত্রিলোচনো হংসারূঢ়ো দ্বিভুজঃ সচক্রদক্ষিণহস্তঃ সমুদ্গরবামহস্তশ্চ ॥ ৮ ॥

বিজয় যক্ষ,—হরিদ্বর্ণ, ত্রিলোচন, হংসবাহন, দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং বাম হস্তে মুদ্গর।

(৯)

অজিতোযক্ষঃ শ্বেতবর্ণঃ কূর্ম্মারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলকুন্ত-কলিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৯ ॥

অজিত যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, কূর্ম্মবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল ও কুন্তশোভিত।

(১০)

ব্রহ্মা যক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সিতবর্ণঃ পদ্মাসনাষ্টভুজো মাতুলিঙ্গমুদ্গরপাশকাভয়যুতদক্ষিণপাণি-চতুষ্টয়ো নকুলগদাঙ্কুশাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, সিতবর্ণ, পদ্মাসন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে মাতুলিঙ্গ, মুদ্গর, পাশ ও অভয়মুদ্রা এবং বামপাণিচতুষ্টয়ে নকুল, গদা, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র।

(১১)

মনুজোযক্ষো মতান্তরেণেশ্বরো ধবলবর্ণস্ত্রিনেত্রো বৃষভবাহনশ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গগদাযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১১ ॥

মনুজযক্ষ, মতান্তরে ঈশ্বর যক্ষ,—শুভ্রকান্তি, ত্রিনেত্র, বৃষভবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও গদা এবং বাম পাণিদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(১২)

অসুরকুমারো যক্ষঃ শ্বেতবর্ণো হংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকবীণান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলকধনুর্যুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১২ ॥

অসুরকুমার যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও বীণা এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুলক ও ধনু।

(১৩)

ষণ্মুখোযক্ষ শ্বেতবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজঃ ফলচক্রবাণখড়্গপাশাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিষট্‌কো নকুলচক্রধনুঃফলকাঙ্কুশাভয়যুতবামপাণিষট্‌কশ্চ ॥ ১৩ ॥

ষণ্মুখ যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশভুজযুক্ত। দক্ষিণ ছয়টী হাতে ফল, চক্র, বাণ, খড়্গ, পাশ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্ত ছয়টীতে ক্রমশঃ নকুল, চক্র, ধনু, ফলক, অঙ্কুশ ও অভয়মুদ্রা।

(১৪)

পাতালোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণো মকরবাহনো ষড়ভুজঃ পদ্মখড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলফলকাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ১৪ ॥

পাতাল যক্ষ,—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, মকরবাহন, ষড়্‌ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে ক্রমান্বয়ে পদ্ম, খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, ফলক ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৫)

কিন্নরোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণঃ কূর্ম্মবাহনঃ ষড়্‌ভুজো বীজপূরকগদাভয়যুক্তদক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলপদ্মাক্ষমালাযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ১৫ ॥

কিন্নর যক্ষ,—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, কচ্ছপবাহন, ষড়্‌ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে বীজপূরক, গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, পদ্ম ও অক্ষমালা আছে।

(১৬)

গরুড়োযক্ষো বরাহবাহনঃ ক্রোড়বদনঃ শ্যামরুচিশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকপদ্মান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১৬ ॥

গরুড় যক্ষ,—বরাহবাহন, বরাহবদন, শ্যামরুচি (শ্যামবর্ণ), চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করদ্বয়ে বীজপূরক ও পদ্মফুল এবং বামকরদ্বয়ে নকুল ও অক্ষমালা আছে।

(১৭)

গন্ধর্ব্বোযক্ষঃ শ্যামবর্ণো হংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদপাশকান্বিতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো মাতুলিঙ্গাঙ্কুশাধিষ্ঠিতবামকরদ্বয়শ্চ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব্ব যক্ষ—শ্যামবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(১৮)

যক্ষেন্দ্রোযক্ষঃ ষণ্মুখস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজো বীজপূরকবাণখড়্গ-মুদ্গরপাশকাভয়যুক্তদক্ষিণকরষট্‌কো নকুলধনুশ্চর্ম্মফলকশূলাঙ্কুশাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিষট্‌কশ্চ ॥ ১৮ ॥

যক্ষেন্দ্র যক্ষ,—ষণ্মুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশ হস্তযুক্ত। দক্ষিণ ছয় হস্ত ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, বাণ, খড়্গ, মুদ্গর, পাশ ও অভয়মুদ্রাযুক্ত, বাম ছয় হস্তে নকুল, ধনু, চর্ম্মফলক (ঢাল), শূল, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

কূবরো যক্ষশ্চতুর্ম্মুখ ইন্দ্রায়ুধবর্ণো গজবাহনোঽষ্টভুজো বরদপরশুশূলাভয়যুক্তদক্ষিণপাণি-চতুষ্টয়ো বীজপূরকশক্তিমুদ্গরাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ১৯ ॥ (কূবরস্থানে কুবেরমাহুঃ)।

কূবর যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, গজবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বরমুদ্রা, পরশু (অস্ত্রবিশেষ), শূল ও অভয় এবং বাম পাণিচতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অক্ষসূত্র আছে।

(২০)

বরুণোযক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রোঽসিতবর্ণো বৃষভবাহনো জটামুকুটভূষিতোঽষ্টভুজো বীজপূরকগদা-বাণশক্তিযুক্তদক্ষিণকরকমলচতুষ্কোনকুলপদ্মধনুপরশুযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২০ ॥

বরুণ যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, কৃষ্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, জটামুকুটভূষিত, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, গদা, বাণ ও শক্তি, এবং বাম হস্তচতুষ্টয়ে নকুল, পদ্ম, ধনু ও পরশু আছে।

(২১)

ভৃকুটিযক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সুবর্ণবর্ণো বৃষভবাহনোঽষ্টভুজো বীজপূরকশক্তিমুদ্গরাভয়যুক্ত-দক্ষিণকরচতুষ্টয়ো নকুলপরশুবজ্রাক্ষসূত্রযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২১ ॥

ভৃকুটি যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, সুবর্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে নকুল, পরশু, বজ্র ও অক্ষসূত্র আছে।

(২২)

গোমেধোযক্ষস্ত্রিমুখঃ শ্যামকান্তিঃ পুরুষবাহনঃ ষড়্‌ভুজো মাতুলিঙ্গপরশুচক্রাঙ্কিতদক্ষিণকরত্রয়ো নকুলশূলশক্তিযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ২২ ॥

গোমেধ যক্ষ,—ত্রিমুখ, শ্যামকান্তি, পুরুষবাহন (নরবাহন), ষড়্‌ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, পরশু ও চক্র, এবং বাম করত্রয়ে নকুল, শূল ও শক্তি আছে।

(২৩)

বামনোযক্ষো মতান্তরেণ পার্শ্বনামা গজমুখ উরগফণামণ্ডিতশিবঃ শ্যামবর্ণঃ কূর্ম্মবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকোরগযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলভুজগযুক্তবামপাণিযুগশ্চ ॥ ২৩ ॥

বামন, মতান্তরে পার্শ্ব যক্ষ,—গজমুখাকৃতি, সর্পফণাশিব, শ্যামবর্ণ, কচ্ছপবাহন ও চতুর্ভুজ-যুক্ত। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বীজপূরক ও সর্প এবং বাম বাহুদ্বয়ে নকুল ও সর্প আছে।

(২৪)

মাতঙ্গো যক্ষঃ শ্যামবর্ণো গজবাহনো দ্বিভুজো নকুলযুক্তদক্ষিণভুজো বামকরধৃতবীজ-পূরকশ্চেতি ॥ ২৪ ॥

মাতঙ্গ যক্ষ,—শ্যামবর্ণ, গজবাহন, দ্বিভুজযুক্ত, দক্ষিণ হস্তে নকুল এবং বাম হস্তে বীজপূরক আছে।

চতুর্ব্বিংশতি যক্ষিণী

(১)

আদিজিনস্য চক্রেশ্বরী দেবী মতান্তরেণাপ্রতিচক্রা সুবর্ণবর্ণা গরুড়বাহনা অষ্টকরা বরদবাণ-চক্রপাশযুক্তদক্ষিণপাণিচতুষ্টয়া ধনুর্বজ্রচক্রাঙ্কুশযুক্তবামপাণিচতুষ্টয়া চ ॥ ১ ॥

চক্রেশ্বরী দেবী, মতান্তরে অপ্রতিচক্রা দেবী,—সুবর্ণবর্ণা, গরুড়বাহনা, অষ্টভুজা। দক্ষিণ পাণিচতুষ্টয়ে বরমুদ্রা, বাণ, চক্র ও পাশ এবং বাম করচতুষ্টয়ে ধনু, বজ্র, চক্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২)

শ্রীঅজিতজিনস্যাজিতাঽজিতবলা বা দেবী গৌরবর্ণা লোহাসনাধিরূঢ়া চতুর্ভুজা বরদ-পাশকাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ২ ॥

অজিতা দেবী বা অজিতবলা দেবী,—গৌরবর্ণা, লোহাসনাধিরূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও অঙ্কুশ আছে।

(৩)

শ্রীসম্ভবস্য দুরিতারিদেবী গৌরবর্ণা মেষবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রভূষিতদক্ষিণভুজদ্বয়া ফলা-ভয়ান্বিতবামকরদ্বয়াচ ॥ ৩ ॥

দুরিতারি দেবী,—গৌরবর্ণা, মেষবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৪)

শ্রীঅভিনন্দনস্য কালীনামা দেবী শ্যামকান্তিঃ পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিতদক্ষিণকর-দ্বয়া নাগাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৪ ॥

কালী দেবী,—শ্যামকান্তি, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে নাগ ও অঙ্কুশ আছে।

(৫)

শ্রীসুমতের্ম্মহাকালী দেবী সুবর্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া মাতুলিঙ্গাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৫ ॥

মহাকালী দেবী,—স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম-করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(৬)

শ্রীপদ্মপ্রভস্যাচ্যুতা মতান্তরেণ শ্যামাদেবী শ্যামবর্ণা নরবাহনা চতুর্ভুজা বরদবাণান্বিত-দক্ষিণকরদ্বয়া কার্ম্মুকাভয়যুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৬ ॥

অচ্যুতা, মতান্তরে শ্যামা দেবী,—শ্যামবর্ণা, নরবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও বাণ এবং বাম করদ্বয়ে ধনু ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৭)

শ্রীসুপার্শ্বস্য শান্তা দেবী সুবর্ণবর্ণা গজবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া শূলাভয়যুক্তবামহস্তদ্বয়া চ ॥ ৭ ॥

শান্তা দেবী,—সুবর্ণবর্ণা গজবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে শূল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৮)

শ্রীচন্দ্রপ্রভস্য জ্বালা মতান্তরেণ ভৃকুটির্দেবী পীতবর্ণা বরালকাখ্যজীববিশেষবাহনা চতুর্ভুজা খড়্গামুদ্গরভূষিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলকপরশুযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৮ ॥

জ্বালা, মতান্তরে ভৃকুটিদেবী,—পীতবর্ণা, বরালক (জীব বিশেষ) বাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করযুগলে খড়্গ ও মুদ্গর এবং বাম করযুগলে ফলক ও পরশু আছে ॥

(৯)

শ্রীসুবিধেঃ সুতারাদেবী গৌরবর্ণা বৃষভবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৯ ॥

সুতারা দেবী,—গৌরবর্ণা, বৃষভবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম ভুজদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে ॥

(১০)

শ্রীশীতলস্যাশোকাদেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা, বরদপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশ-যুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১০ ॥

অশোকা দেবী,—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ বাহুযুগলে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম বাহুযুগলে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১১)

শ্রীশ্রেয়াংসস্য শ্রীবৎসাদেবী মতান্তরেণ মানবী গৌরবর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বরদপাশযুক্ত-দক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়াচ ॥ ১১ ॥

শ্রীবৎসা দেবী, মতান্তরে মানবী দেবী—গৌরবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে।

(১২)

শ্রীবাসুপূজ্যস্য প্রবরাদেবী মতান্তরেণ চণ্ডা শ্যামবর্ণা তুরগবাহনা চতুর্ভুজা বরদশক্তিযুতদক্ষিণ-করযুগা পুষ্পগদান্বিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ১২ ॥

প্রবরা বা চণ্ডা দেবী,—শ্যামবর্ণা, তুরগবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও শক্তি এবং বাম করদ্বয়ে পুষ্প ও গদা আছে।

(১৩)

শ্রীবিমলস্য বিজয়া মতান্তরেণ বিদিতাদেবী হরিতালবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বাণপাশযুক্ত-দক্ষিণকরদ্বয়া ধনুর্নাগযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৩ ॥

বিজয়া, মতান্তরে বিদিতা দেবী,—হরিতালবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বাণ ও পাশ, বাম হস্তদ্বয়ে ধনু ও নাগ আছে।

(১৪)

শ্রীঅনন্তজিনস্য অঙ্কুশাদেবী গৌরবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা খড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৪ ॥

অঙ্কুশা দেবী,—গৌরবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১৫)

শ্রীধর্ম্মস্য পন্নগাদেবী মতান্তরেণ কন্দর্পা গৌরবর্ণা মৎস্যবাহনা চতুর্ভুজা উৎপলাঙ্কুশযুক্তদক্ষিণ পাণিদ্বয়া পদ্মাভয়াযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৫ ॥

পন্নগা দেবী, মতান্তরে কন্দর্পা দেবী,—গৌরবর্ণা, মৎস্যবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও অঙ্কুশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে।

(১৬)

শ্রীশান্তিনাথস্য নির্ব্বাণীদেবী কনকরুচিঃ পদ্মাসনা চতুর্ভুজা পুস্তকোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া কমণ্ডলুকমলকলিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৬ ॥

নির্ব্বাণী দেবী,—স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং বাম করদ্বয়ে কমণ্ডলু ও কমল আছে ॥

(১৭)

শ্রীকুন্থোবচ্যুতাদেবী মতান্তবেণ বলাভিধানা কনকচ্ছাবির্ম্ময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা বীজপূরক-শূলাহিতদক্ষিণপাণিদ্বয়া মুষুণ্ডিপদ্মান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৭ ॥

অচ্যুতা, মতান্তরে বলা দেবী,—কনকছবি, ময়ূববাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ কবদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল এবং বাম পাণিদ্বয়ে মুষুণ্ডি ও পদ্ম আছে।

(১৮)

শ্রীঅবজিনস্য ধাবণীদেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা মাতুলিঙ্গোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া পদ্মাক্ষসূত্রান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৮ ॥

ধারণী দেবী,—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও পদ্ম এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

শ্রীমল্লিজিনস্য বৈরোট্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া বীজপূরকশক্তিযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৯ ॥

বৈরোট্যা দেবী,—কৃষ্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূবক ও শক্তি আছে।

(২০)

শ্রীমুনিসুব্রতস্য অচ্ছুপ্তাদেবী মতান্তবেণ নবদত্তা কনকরুচির্ভদ্রাসনারূঢ়া চতুর্ভুজা বরদাক্ষ-সূত্রযুক্তদক্ষিণভুজদ্বয়া বীজপূরকশূলযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ২০ ॥

অচ্ছুপ্তাদেবী, মতান্তরে নরদত্তা,—কনকবর্ণা, ভদ্রাসনারূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর-মুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূবক ও শূল আছে।

(২১)

শ্রীনমিজিনস্য গান্ধারীদেবী শ্বেতবর্ণা হংসবাহনা চতুর্ভুজা বরদখড়্গাযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া বীজ-পূরককুন্তকলিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ২১ ॥

গান্ধারী দেবী,—শ্বেতবর্ণা, হংসবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও খড়্গা এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও কুন্ত (বর্ষাবিশেষ) আছে।

(২২)

শ্রীনেমিজিনস্য অম্বাদেবী কনককান্তিরুচিঃ সিংহবাহনা চতুর্ভুজা। আম্রলুম্বিপাশযুক্ত দক্ষিণ-করদ্বয়া পুত্রাঙ্কুশাসক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ২২ ॥

অম্বাদেবী,—স্বর্ণবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে আম্রলুম্বি ও পাশ এবং বাম-করদ্বয়ে পুত্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২৩)

শ্রীপার্শ্বজিনস্য পদ্মাবতীদেবী কনকবর্ণা কুর্কুটসর্পবাহনা চতুর্ভুজা পদ্মপাশান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলাঙ্কুশাধিষ্ঠিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ২৩ ।

পদ্মাবতীদেবী--কনকবর্ণা, কুর্কুটসর্পবাহনা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ করদ্বয়ে পদ্ম ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে ফল ও অঙ্কুশ আছে।

(২৪)

শ্রীবীরজিনস্য সিদ্ধায়িকাদেবী হরিদ্বর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা পুস্তকাভয়যুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকবীণাভিরামবামকরদ্বয়া চেতি ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধায়িকা দেবী,—হরিদ্বর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ করযুগলে ক্রমান্বয়ে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করযুগলে বীজপূরক এবং বীণাযন্ত্র আছে।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

পূজায় বৈচিত্র্য

আমরা আফ্রিকার সর্প দেবতার গল্প শুনে কৌতুক অনুভব করি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক গৃহে, প্রতিমাসে কত প্রকার জীব, জন্তু, বৃক্ষ বা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের যে কত ভাবে আমরা পূজা করে থাকি, তার ইতিহাস সংগ্রহ করলে একটী বিরাট্ পুস্তকের আকার ধারণ করে।

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রয়োজনীয় বা যার দ্বারা আমরা কণামাত্র উপকার পাই, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানের সত্তা বিরাজমান, ইহাই হিন্দুদিগের ধারণা। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুদের প্রত্যেক জাতি তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জনের সরঞ্জাম বা উপাদান-গুলিকে ভক্তি সহকারে পূজা করে থাকেন। ইহা ব্যতীত এই সকল পূজার উপচারের বা দেবতার বিভিন্নতার বা তাঁহাদের বরদানের প্রণালীর বিচিত্রতাও অসংখ্য রকমের।

কুমারেরা পূজা করেন—তাঁহাদের চাক, ময়রারা গণেশ পূজার দিন পূজা করেন গুড়ের পায়া; হাড় বলিয়া মেদিনীপুরে এক জাতি বাস করেন তাঁরা সরস্বতী পঞ্চমীর দিন রঙ্কিণী দেবীর যে পূজা করেন তাতে দেবতার আসনে বসানো হয় একটি লোহার হাতা ও একটি লোহার ছুরিকে। ধোপারা তাদের কাপড় কাচবার পাথরকে পূজা করে ও তার মান্যের জন্য একদিন বিশ্রাম বার পালন করে। এখানে পশ্চিমদেশীয় জাতি যাঁরা বাস করেন তাঁদের দেখতে পাই, গাত্রহরিদ্রার দিন মেয়েরা গান করতে করতে মাঠে যেয়ে মাঠের পূজা করেন। তার নাম—"মাঠ কোড়া"। তাদের কার্ত্তিক মাসে ষষ্ঠীর দিন যে ব্রত হয়, তাতে সূর্য্যপূজা করে ফেরবার সময় ব্রতধারিণীরা রাস্তায় পতিত গোবরের উপর সিন্দুর ও চাল-গোলা জল দিতে দিতে যান। এও ব্রতের অঙ্গবিশেষ।

সোণার বেণেদের মধ্যে একটি বার্ষিক পূজা প্রচলিত আছে। উহার নাম "সুয়ো দুয়ো"। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন বেণেদের ঘরে ঘরে এই পূজা হয়। পূজার জন্য কলাগাছ কেটে তার ডিঙ্গি করতে হয়। কোন কোন বংশে মালিবাড়ী হতে সোলার ডিঙ্গি কিনে আনে। তাতে দিতে হয়—পোরো একটা, জোড়া কুল, জোড়া সিম, বেতো শাক, মূলো, লাউফুল, ক্ষীরের পুতুল দুইটি, ঘৃতের প্রদীপ দুইটি ও গাঁদা ফুল প্রভৃতি। অপরাহ্ণ দুইটা তিনটার সময় পুরোহিত এসে ডিঙ্গা পূজা করেন। বাড়ীর গৃহিণী সারাদিন উপবাস করে থাকেন। পুরোহিতের বাড়ীর গৃহিণী এসে "সুয়ো দুয়ো" ব্রতকথা শুনিয়ে যান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভৃত্য ডিঙ্গা ভাসাইবার নিমিত্ত পুকুরে বা নদীতে নিয়ে যায় ও ছেলে মেয়েরা কাঁসী বাজাতে বাজাতে বলে,—

"সুয়ো দুয়ো যায় ভেসে।
সাত ভাই আসে হেঁসে॥

এখানে সুয়ো দু'য়ো পূজার ব্রতকথা সংক্ষেপে বলতে ইচ্ছা করি।—

* ১৩৩৫।২৬এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

একজন সদাগর ছিল। তার সাত পুত্র ও এক কন্যা। ঐ সাত পুত্র পিতার বৃদ্ধ বয়সে ডিঙ্গা নিয়ে সদাগরিতে যাত্রা করে ও পথিমধ্যে নৌকা লাগিয়ে এক ডাকাতের বাড়ীতে পাকশাকের আয়োজন করে। ঘটনাক্রমে ঐ বাড়ীটি তাদের ভগ্নীর ও ডাকাতের। ডাকাতের মা ঐ সাত ভাইকে আদর করতে লাগল ও পুত্রদের আসার অপেক্ষায়, দেরী করিবার জন্য তাহাদিগকে ভিজা কাঠ, ভিজা উনান ও ছেঁড়া কলাপাত দিল। ভগ্নীর কৌশলে ভাইয়েরা যখন জানতে পারল যে, তারা ডাকাতের বাড়ীতে এসেছে, তখন তারা একে একে নৌকা খুলে পালিয়ে যায়। ডাকাতেরা চেষ্টা করেও যখন ধরতে পারল না, তখন সাত ভাইকে বলল,—"যাবে বেটা যা, তোর মা কলা দিয়ে পুজেছিল, গলা এড়িয়ে গেলি ; যাবে বেটা যা, তোর মা সিম দিয়ে পুজেছিল, সিমসিমিয়ে গেলি, যাবে বেটা যা, তোর মা কুল দিয়ে পুজেছিল, কুলকুলিয়ে গেলি, যাবে বেটা যা, তোর মা ক্ষীর দিয়ে পুজেছিল, ক্ষীর হয়ে গেলি, যাবে বেটা যা, তোর মা বেতো দিয়ে পুজেছিল, কলা দেখিয়ে গেলি। তোর মা মূল দিয়ে পুজেছিল, মূলমূলিয়ে গেলি। যাবে বেটা যা, তোর মা সুয়ো দুয়োর পূজা করেছিল, তাই বেঁচে গেলি", ইত্যাদি।

মন্থনষষ্ঠী পূজায় পূজা করা হয়—একখানি পাখা ও একটি বংশনির্ম্মিত মন্থন-দণ্ডের। ঘণ্টাকর্ণ পূজায় গোবরের নাড়ু ও কড়ি চাই। সাবিত্রী ব্রতে লাঙ্গল পূজা না করিয়া উপবাস ভঙ্গ করা যায় না। বিয়ের আগে ঢেকি বরণ করে, পরে গায়ে হলুদের হলুদ কোটা চাই। ষষ্ঠী পূজায় শিল মাতারূপে ও নোড়া তার পুত্ররূপে পূজা পেয়ে থাকেন। অরন্ধনের দিন পূজা করতে হবে হাঁড়ির ও উনুনের। বিয়ের পরে বাসর-ঘরে ঢোকবার সময় ঝাঁটা দেবীকে ষষ্ঠীরূপে দেখতে পাওয়া যায়। কালী পূজার দিন শেষ রাত্রে মেদিনীপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকের বাড়ীতে "মশা তাড়ানো" ব'লে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে কুলোকে আখের ডগা দিয়া বাজাতে বাজাতে ছেলেরা গান করে,—"এ পাড়ার মশারা ও পাড়ায় যা, অমুক দাদা বা দিদির গায়ে বসে খা। এ পাড়ার মশারা ও পাড়ায় যা, অমুক দাদা বা দিদির গায়ে বসে খা", ইত্যাদি। সেখানে কুলোকে বাদ দিলে উৎসবই চলবে না।

এবারে এখানকার কতকগুলি রকমারি জন্তু পূজার কথা বলব। আপনারা গোমাতা ও হনুমান্ জীউ ঠাকুরের পূজার কথা শুনেছেন। কিন্তু লালগড় অঞ্চলে ধান পাকার পর কয়েকটি ঠাকুরের পূজা হয়, তাদের নাম যথাক্রমে "বেঘাশিনি বা বাঘাৎ, বরাশিনি ও নেকড়াশিনি।" এগুলি ব্যাঘ্ররাজ বা বরাহপুঙ্গবের দেব-নাম। তারা দয়া করে যাতে মানুষের বা ধান্যের অনিষ্ট না করে, তার জন্য গ্রামবাসীরা পাঁঠা ও মদ মানসিক করে থাকে। ঐ পূজার দিন উপবাস করে থাকতে হয় ও এক শনি বা মঙ্গলবার গাঁয়ের বাইরে, বনের ধারে এক গাছের তলায় মদ ও পাঁঠা নৈবেদ্য সহযোগে পূজা দিতে হয়। পূজার পর সকলে ঠাকুরের প্রসাদ পায় ও সারা রাত ধরে নাচগান চলতে থাকে।

জিতাষ্টমীর ব্রতে শিয়াল ও চিলের মূর্ত্তি গড়তে হয় ও ব্রতধারিণী তাহাদিগকে সকালে মন্ত্র-

মার্জ্জনী ও জলখাবার দিয়ে আবাহন করেন ও বাত্রে পিঠে পায়স দিয়ে ভোগ দেন। ব্রতের পরদিন তাহাদিগকে পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিয়ে এসে, পরে ব্রতভঙ্গ করতে পান। বড়ামের পূজার সময় মাটির ঘোড়া ও মাটির হাতীর পূজা হয়। জেলেরা কোনও বড় পুকুরে মাছ ধরতে নামবার আগে, কুমীরের পূজা না দিলে জলে নামতে সাহস করে না। মেদিনীপুরে আর একটি জন্তুর পূজা দেখতে পাই। গ্রীষ্মকালে যে বৎসর ইন্দ্রদেব বারিদানে অযথা বিলম্ব বা কার্পণ্য করেন, সেই সময় এ দেশের এক শ্রেণীর লোক বৃষ্টি হবার জন্য "ব্যাং"এর পূজা করে থাকে। এরা একটি কোলা ব্যাং ধরে, তাকে হলুদ মাখায় ও তার মাথায় সিন্দুর দিয়ে একটি হলদে নেকড়া গায়ে পরিয়ে দেয়। পরে তাকে একটি থালায় বসিয়ে দল বেঁধে, সুর করে এই গানটি গাইতে গাইতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে,—"ব্যাং পড়া পড় পানি দে, নদী নালা ভাসিয়ে দে। ব্যাং পড়া পড় পানি দে, নদী নালা ভাসিয়ে দে" ইত্যাদি। আর চাল-পয়সা যা ভিক্ষা পায়, তা নিয়ে এক পুকুরের ধারে উপস্থিত হয়। সেখানে ব্যাংটির পূজা করে, তার মাথায় সকলে অনবরত জল ঢালতে থাকে। তাদের ধারণা, আকাশ হতে ঐরূপ অজস্রধারে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। পরে ভিক্ষালব্ধ চাল প্রভৃতি রন্ধন করে ভোগের উৎসব চলতে থাকে। তমলুক মহকুমার দোবো অঞ্চলে "বদর" পূজা হয়। নৌকা প্রভৃতি জলযানের নিরাপদের জন্য এ পূজার অনুষ্ঠান। বৎসরের সব সময় সকলেই এ পূজা করতে পারেন।

এইবারে গাছের পূজার কথা। ইতু বা মিত্রপূজায় কত রকম ওষধির আবশ্যক হয়, তা আপনাদের জানা আছে। মহিষাদলে গাছতলায় "পঞ্চ দেবতা" বলে এক রকম ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়, বাড়ীর ছেলে মেয়েদের অসুখ নিরাময়ের জন্য মানৎ করে। তাতে পূজার আগের দিন নিরামিষ খেয়ে থাকতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পান গাছের বরোজে পূজা দিতে হয়। আম কাঁটাল গাছের পূজা না দিলে অনেকে সেই গাছের উৎপন্ন ফল খান না। জগদ্ধাত্রী পূজার দিন ধাত্রী বা আমলা বৃক্ষের পূজা দিতে দেখেছি। মেয়েরা ঐ গাছতলায় নৈবেদ্য নিয়ে যেয়ে নিজেরা পূজা করে আসেন। আর একটি গাছ আপনারা খুব চেনেন—'শেওড়া গাছ'। দুইবার বিপত্নীক হবার পর এ গাছের সঙ্গে বরের বিয়ে হলে, তবে বিয়ে করতে যাবার প্রথা চলে আসছে।

শেষে আর একটি পূজার কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ করব। এ উৎসবটি প্রত্যেক চাষীর। এর নাম নলডাকা। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই অনুষ্ঠান হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্ব-দিন চাষীরা নল বা অভাবে শর কেটে এনে পুকুরে ভিজিয়ে রাখে। পরে আদা, হলুদ, মান, ওল, শষা ডাঁটা, কাঁটানটে, শিয়াল কাঁটা, শাল ঝাটি, আম্রপানি, পুরাতন ধান, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্যকে কাটারি করে কেটে, গাওয়া ঘি ও মধু মাখিয়ে, বড়ের কুড়ি গাছের পাতায় বেঁধে ঐ নলের গাঁটে সন্ধ্যা বেলা বাঁধে। পরে ভোর বেলা সূর্য্য উঠবার আগে ঐ নলগুলি মাঠে নিয়ে যায়। ধানের ক্ষেতে কতকগুলি ছড়া আছে, সেগুলি ব'লে ঐ নলগুলি মাঠে পুততে হয়। এরূপ করলে ধান শীঘ্র ফলবে বলে প্রবাদ। পরে আড়াই হালা (মুঠো) ঘাস কেটে একটি নলের সঙ্গে